সাপ্তাহিক সংকলন

রেজি: ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-৩ | সোমবার, ২৫ ভাদ্র ১৪২০, ০২ জিলকদ ১৪৩৪, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

কবি নজরুলের মানুষ কবিতার মর্মবাণী: ৬

সত্য বলার জ্বালা: ১৩

জনতার নামে চলছে সব: ১৪

ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন? ১৯

কেন তিনি কলেজের শিক্ষকতা ও মসজিদের এমামতি ছাড়লেন? ৭

জঙ্গিবাদ নির্মূলে যামানার এমামের প্রস্তাবনা

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

দৈনিক দেশেরপত্র

সম্পাদকীয়

জঙ্গিবাদের উৎস এবং আমরা

সরকারের শেষ সময়ে এসে হঠাৎ জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পত্র-পত্রিকায় পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছে জঙ্গি-কাহিনী। বিদেশী দূতদের ঘন ঘন সভা-সেমিনার হচ্ছে। রাজনীতিবিদগণ মাঝে মাঝেই তাদের সাথে ভোজসভায় মিলিত হচ্ছেন। এমন কি বিচারকগণও আগ্রহ সহকারে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছেন। বাতাসে গুঞ্জন- এর পেছনে অন্য কোন খেলা কাজ করছে। প্রভুদের কথা আমাদের কাছে বেদবাক্যের মত। আর হবেই না কেন? আমরা যে গরীব! তাদের টাকায়, দান-খয়রাতে আমাদের অর্থনীতি চলে। মোড়ল রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক সেই খাতক-মহাজনের মত যে খাতক বৃদ্ধ মহাজনের মন রাখতে নিজ নাবালিকা কন্যাকে মহাজনের কাছে তুলে দেয়।

সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, "সন্ত্রাসবাদ যদি মুদ্রার একপিঠ হয়, তাহলে এর অন্য পিঠেই আছে অর্থ। অর্থই সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক, অর্থই সন্ত্রাসবাদকে সম্ভব করে, অর্থই সন্ত্রাসবাদের অক্সিজেন।" তিলকে তাল বানিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করার সাম্রাজ্যবাদী নীতি আমাদের অজানা নয়। স্নায়ুযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের অধঃপতন হয় মূলত ১৯৭৯ সালে আফগান দখলকে কেন্দ্র করে। এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য আফগানিদের পক্ষ হয়ে অর্থ, অস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ, মোজাহেদীনদের রিক্রুট, প্রচার-প্রচারণার কাজগুলো করে দিয়েছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে তখন একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাদের অতীত কার্যকলাপের ফল কিছুটা বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। তাদেরই অর্থ ও সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেহাদীরা হয়ে উঠে তাদের প্রধান শত্রু। দুঃখের বিষয় এই যে তারা ছিল ইসলাম ধর্মের দাবিদার। দুঃখের বিষয় বললাম এই জন্য যে তারা যদি ইসলাম না হয়ে খ্রিস্টধর্মের বা অন্য কোন ধর্মের হোত, তবে তাদের কপালে জঙ্গি খেতাবটা জুটত না।

'জঙ্গ' শব্দটা ফারসী, এর অর্থ হোল যুদ্ধ (War)। আর জঙ্গী শব্দের অর্থ যে বা যারা যুদ্ধ করে, অর্থাৎ যোদ্ধা, ইংরেজিতে Warrior, Fighter. অর্থগত হিসেবে বিবেচনা করলে জঙ্গী শব্দের অর্থ হোল যোদ্ধা। এই হিসেবে গত একশত বছরে শুধু আমেরিকা, ব্রিটেন, ইসরাইল এই সম্মিলিত শক্তি সারা দুনিয়া জুড়ে কতটি যুদ্ধ করেছে, কত দেশ ধ্বংস করেছে, কত জায়গায় তাদের সামরিক ঘাঁটি গঠন করে কি পরিমাণ সামরিক অস্ত্রের মজুদ এবং সৈন্য মোতায়েন করেছে সেই পরিসংখ্যান দাঁড় করালে পৃথিবীর সবচাইতে বড় জঙ্গি দেশ যে তারাই তা অস্বীকার করা হবে সত্যের অপলাপ।

যাই হোক, কথিত এই নতুন জঙ্গিদের ধ্বংস করার জন্য চালু করা হোল নতুন যুদ্ধ। এই উগ্রবাদীদের নতুন 'ট্যাগ' দেওয়া হোল 'জঙ্গি'। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হলেন তাদেরই প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ওসামা বিন লাদেন। এই জঙ্গীদের কিন্তু কোন অস্ত্রের কারখানা ছিল না। তাদের হাতের বেশিরভাগ অস্ত্রই ছিল যুক্তরাষ্ট্রেরই দেওয়া এবং কিছুটা ছিল রাশিয়ার হাত থেকে হস্তগত করা। অন্যদিকে 'জঙ্গিবাদের অক্সিজেন' অর্থ-বিত্তের নিয়ন্ত্রক ও মালিক তো একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই। ইরাক, আফগান এবং পাকিস্তানে পরিচালিত যুদ্ধের পেছনে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র খরচ করেছে ৩.২ ট্রিলিয়ন থেকে ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ডলারের পরিমাণ যে কি পরিমাণ তা আমাদের দেশের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। এই টাকা কোথা থেকে আসে? এ অর্থ লুটের মাল। সেই তারাই যখন অর্থকে জঙ্গিবাদের যোগানদাতা বলে অভিহিত করেন, আর আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীরা যখন মাথা ঝুঁকিয়ে এ কথার সায় দেন, কেউ প্রতিবাদ করেন না। কারণ আমরা গরীব। দুঃখের বিষয় আমরা প্রভুদের প্রবর্তিত 'ভাগ কর এবং শাসন কর' (Divide and Rule) নীতির শিকার হয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে আছি। আমাদের নেতা-নেত্রীদের কোমরে নেই জোর। তারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অন্যের অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের দেশের ছেলে নাফিসকে তারা কথিত স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে ফাঁদে ফেলে আটক করলো, বিচার করলো, ৩০বছর কারাদণ্ড দিল। আর তাদের ছেলে নরওয়ের ব্রেইভিক ৯২ জনকে গুলি করে হত্যা করল, বোমা ফাটাল, তাকে নামে মাত্র শাস্তি দিল মাত্র ২১ বছর। এখন তাকে আবার বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে সভ্য করানো হচ্ছে। সকলের ভালই জানা আছে নাফিস যে অপরাধ করেছে তার পেছনে 'অক্সিজেন' যোগানোর কাজটি কিন্তু করেছে তাদেরই দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, তাদের মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণামূলক চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদেরকে জ্ঞান দিতে পারেন কারণ আমরা ঐক্যবদ্ধ নই, আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থে দলাদলি এবং কোন্দলে ডুবে আছি। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করাতে পারলেই আমরা খুশি। কিন্তু এর ফল শেষতক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কি আমাদের নেতা-নেত্রীরা ভেবে দেখেছেন? তারা কি ভাবেন জঙ্গিদের অস্ত্রের যোগান কোত্থেকে আসে? মনে রাখতে হবে এসব তারাই বিলি করছে যারা অদূর ভবিষ্যতে এসবের অজুহাতে আমাদের উপর আক্রমণ করে আমাদের ধ্বংস করবে- অন্তত নিকট অতীত আমাদের তাই জানাচ্ছে। তখন আমাদের মধ্য থেকেই কেউ একজন বেরিয়ে আসবে হামিদ কারজাই, একজন নুরে মালেকী।

আসল কথা হচ্ছে, কোমরে জোর থাকলে অন্যদের ডেকে না এনে আমরাই জঙ্গীপনা নির্মূল করতে পারতাম। তখন আমাদেরকে বাধ্য শ্রোতার মত তাদের মুখ থেকে এইসব নীতি কথা শুনতে হোত না। আমাদের নেতা-নেত্রীরা সজাগ হবেন কি? না কি একজন কারজাই, একজন নুরে মালিকী হতেই তারা বেশি আগ্রহী?

সূচিপত্র

সমকালীন ভাবনা
অসুরের কাছে অমৃত মিলে না-৩
মানুষ-৪
কবি নজরুলের মানুষ কবিতার মর্মবাণী-৬
কেন তিনি কলেজের শিক্ষকতা ও মসজিদের এমামতি ছাড়লেন?-৭
এসলাম (শান্তি) প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত কর্মসূচি-৯
মো'মেনের সংজ্ঞা কি?-১১
তারা পশুর ন্যায় বরং আরো নিকৃষ্ট-১২
সত্য বলার জ্বালা-১৩
জনতার নামে চলছে সব...-১৪
শোষণের হাতিয়ার-১৬
ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?-১৯
ভারতীয় অবতারদের প্রসঙ্গে কেন লিখছি? -২২
একদা কর্ম চঞ্চল মসজিদ আজ তালাবদ্ধ-২৪
জঙ্গিবাদ নির্মূলে যামানার এমামের প্রস্তাবনার বিকল্প নেই-২৫
সরল এসলামই সনাতন জীবনপথ-৩০
আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই-৩২

যে সিস্টেম হরতালের নামে মানুষের সম্পদের ক্ষতি সাধনের লাইসেন্স দেয় সে সিস্টেমটাকে আর কতদিন লালন কোরবেন?

আসুন সিস্টেমটাকেই পাল্টাই

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৮৫৩৯৯৩২২২, ০১১৯১৩৬৭১১০]

সমকালীন ভাবনা

অসূরের কাছে অমৃত মিলে না

সপ্তাহটি সরবে কাটিয়া গেল। তথাপিও দিন কতক আগেকার বিষয় নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই। তিস্তা নদীর জল ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দাদাদের নিকট হইতে তৃষ্ণার জল আদায়ে ব্যর্থ হইয়া ক্ষুন্নচিত্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন আমাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়া। দাদাদের এহেন বিমাতাসুলভ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া আমার কেবলই স্মরণ হইতেছে মহর্ষি মনুর একটি উক্তি। তিনি কহিয়াছেন, "সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মুখ্য প্রযত্ন সহকারে কূপ, জপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। সলিলপূর্ণ কূপ খননকর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু, মনুষ্য ও গোসমুদয় জলপান করে, তাঁহার সমুদয় বংশ পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীস্মকালে যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিষিদ্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে, তিনি, কদাচ বিপদে নিপতিত হয়েন না (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব পৃ: ১০০৯; পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়)।

যে দাদাদিগের ধর্মে এইরূপ শিক্ষা, তাহারা কি করিয়া ভাটির দেশের মনুষ্যকূলকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরপ্রদত্ত জলাধারের প্রবাহ রুদ্ধ করিবার জন্য এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ করে? ইহাদের অবতারগণ কি এই শিক্ষাই দেন নি যে, জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর? কাজেই মনুষ্য মারিবার বন্দোবস্ত কোন দিন মানবীয় হইতে পারে না, উহা কেবলই আসুরিক কর্ম। এই অমানবিক আসুরিক দাজ্জালীয় সভ্যতা আসিয়া দ্বিজকুলকে এহেন অসুর করিয়া দিয়াছে।

পশ্চিমা দাজ্জালীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের অর্ধ শতাব্দী কাল পূর্বের এক নারকীয় ঘটনা অবলোকন করিলে যারপরনাই বিস্মিত হইতে হয়। উহারা নিজেদের অবতারকে "শান্তির যুবরাজ" বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন আর নিজেরা মর্তবাসীকে প্রতিক্ষণে হিতোপদেশ বর্ষণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখেন। অথচ তাহারাই সমুদ্রকন্যা হিরোশিমা, নাগাসাকি নগরদ্বয় শশ্বানভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, তথা হইতে মনুষ্যকূল সমূলে বিনাশ করিয়া দিয়াছেন, আজও সেই পাশবিকতার দগদগে ঘা বহিয়া বেড়াইতেছে চেরিফুলের দেশের মানুষ ও তাদের উত্তর-প্রজন্ম।

শান্তিবাদী বুদ্ধের যারা পূজারী, গেরুয়া বসনে ভূষিত যাহাদের অঙ্গ, যাহাদের ধর্মগুরুরা পথ চলিবার সময় অগ্রবর্তী অনুচরেরা সম্মার্জনী দ্বারা পথ মার্জনা করেন যাহাতে গুরুর পদতলে পিষ্ট হইয়া কোন পিপীলিকার প্রাণও সংহার না ঘটে, জীব হত্যা মহাপাপ জ্ঞান করিয়া আমৃত্যু নিরামিশ আহার করিয়া জীবনপাত করেন, সেই বৌদ্ধরা প্রায়শই জীবন্ত মনুষ্য অগ্নিদগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণত করিয়া চলিয়াছেন।

প্রশ্ন হইল, কোন অসুরের হাতে পড়িয়া স্রষ্টার এই প্রিয়তম সৃষ্টি মনুষ্যকুল দানবকুলে পরিণত হইল? এই প্রশ্নের জবাব হইল, জড়বাদী, বস্তুবাদী ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' তথা দাজ্জালীয় ব্যবস্থাই হইল সেই অসুর। যতদিন না এই দ্বিপদ প্রাণীগুলি সেই আসুরিক ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাপ্রভু, পরমেশ্বর আল্লাহ-প্রদত্ত সত্য সিস্টেমে ফিরিয়া আসিবে, ততদিন এই দাজ্জাল নামক বিষবৃক্ষ বিষময় ফলই উৎপাদন করিয়া যাইবে, মনুষ্যকূলে কেবল অসুর আর পশুই জন্মলাভ করিবে। এই সরল সত্যটি আমাদের দিপুজীদের হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসিয়াছে যে, "অসূরের কাছে অমৃত মিলে না" এবং "দানবের ঔরসে দেবতা জন্মে না"। কাজেই বারম্বার দংশিত হইয়াও বিষধর বাসুকির নিকট চুম্বন কামনা করিবেন না, উহার চুম্বনেও বিষ। যেখানে মানবীয় সকল গুণাবলী বিলুপ্ত হইয়া আসুরিক বদ-খাসলত ভর করিয়াছে, সেখানে অনর্থক এদিক ওদিক ছুটাছুটি না করিয়া স্বীয় পদস্তম্ভে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করাই শ্রেয়।

মানুষ

কাজী নজরুল ইসলাম

বাবার তোলা ছবিতে অসুস্থ কবি নজরুল

সুহৃদ পাঠক,

"মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশেরপত্র যাত্রা শুরু করে। আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে, আমরা সর্বাবস্থায় সত্য প্রকাশ করে যাব। যিনি সত্য বলবেন, সত্যকে ধারণ করবেন, সত্যকে প্রকাশ করবেন, তার বক্তব্য ও লেখা আমরা আমাদের পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরব। তিনি যে ধর্ম, বর্ণ বা দেশের মানুষই হোন না কেন, তার কথা আমাদের পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের হাতে তুলে দেব এনশাল্লাহ। সত্য এক ও অবিভাজ্য। সত্যের এক রূপ। সত্য আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। অপরদিকে মিথ্যা বহুরূপী। মিথ্যায় আচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে দেয়ার জন্য চিরকালই সাহিত্য একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে এসেছে। সংবাদপত্রও একপ্রকার সাহিত্যকর্ম। কাজী নজরুল ইসলামের কলম ছিল সত্যের পক্ষে ক্ষুরধার হাতিয়ার। মিথ্যা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে, গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করতে তিনি তার কাব্যে, গানে, উপন্যাসে বিদ্রোহের দামামা বাজিয়ে গেছেন। কিন্তু নজরুলের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হল, তিনি চিরকালই অবহেলিত রয়ে গেছেন। কেবল জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ছাড়া তার কথা কেউ স্মরণেও আনেন না। অথচ তার রচনাগুলি আজও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয়, এই শাসন, শোষণ, অন্যায়, অবিচার, অশান্তিতে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থায় কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিঝরা সাহিত্য কর্ম নতুন করে বিপ্লবের প্রেরণা যোগায়, বিদ্রোহের আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না যে, কবির সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কও ছিল। শেষ বয়সে কবিকে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ঢাকাতে নিয়ে আসেন তখন তাঁর উদ্যোগেই কবির সুচিকিৎসার জন্য ছয়জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। সেই বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন আমার বাবা মহামান্য এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। বোর্ডের সকল ডাক্তারই ছিলেন এ্যালোপ্যাথ, কেবলমাত্র আমার বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথিস্ট। তাঁর চিকিৎসার ফলেই কবি ধীরে ধীরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু দর্শনার্থীদের ভিড়ের কারণে কবি ঘুমাতে পারতেন না। এজন্য অন্য অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা কবিকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। এসব কারণে বাবার চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়। বাবা প্রায়ই আফসোস করে বলতেন, 'কবি নজরুলের জন্য আমি যে ঔষধ নির্বাচন করেছিলাম সেটা চমৎকার ফল দিতে আরম্ভ করেছিল। আমি তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে খুব আশান্বিত ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি আবার তাঁকে দিয়ে একটি লাইন হলেও লেখাব।' চিকিৎসা ছাড়াও ঢাকার নজরুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বাবা ছিলেন অন্যতম, তিনি নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্যও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুলএকাডেমি বাবার উদ্যোগেরই ফল। তিনি নজরুলের সাহিত্যের সংরক্ষণের বিষয়ে দারুণ

অব্যবস্থা লক্ষ্য করে অনুধাবন করেন যে এ নিয়ে সরকারি উদ্যোগে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা দরকার। তখন তিনি এই প্রস্তাব দেন যে, শান্তি নিকেতনের মতো নজরুলের সমস্ত লেখা, সাহিত্য সংকলন এক জায়গায় থাকা দরকার। তার সঙ্গে নজরুলের গুণগ্রাহী, শিল্পীরা একমত পোষণ করেন। এভাবেই নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানটিও নজরুলকে সাধারণ মানুষের কাছে সেইভাবে তুলে ধরতে পারছে না। একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে আমারও একান্ত ইচ্ছা, নজরুল ইসলামকে তার স্বমহিমায় যতটুকু পারি উদ্ভাসিত করে তুলব। এজন্য আমাদের সীমিত সাধ্যে তাঁর কবিতাগুলির মর্মবাণী একে একে প্রকাশ করতে ইচ্ছা রাখি। আমি চেষ্টা করব জন্ম-মৃত্যু দিবসের কারাবাস থেকে নজরুলকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ের কবি, বিদ্রোহের কবি, সত্যিকারভাবে জাতীয় কবিরূপে তুলে ধরতে। আমাদের আজকের কবিতাটির নাম "মানুষ"। এখন সময় এসেছে নজরুলের কবিতাকে কেবল পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে হৃদয় দিয়ে কবিতাগুলির অন্তর্নিহীত সত্যগুলি উপলব্ধি করার।

-বিনীত সম্পাদক

মানুষ

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
'পূজারী, দুয়ার খোল,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হোল!'
স্বপ্ন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোল বাবা, খাইনি ক' সাত দিন!'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারী ফুকারি' কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'

মসজিদে কাল শিরনী আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি!
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে-আজারির চিন্
বলে 'বাবা, আমি ভুখা ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'
তেরিয়াঁ হইয়া হাঁকিল মোল্লা - "ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?"
ভুখারী কহিল, 'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল- তা' হলে শালা
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে-
"আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা'বলে বন্ধ করোনি প্রভু
তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!"

কোথা চেঙ্গিস গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!
মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি' মরি'
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল! মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।
আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মাদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর,-বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি এঁরা পিতা-পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম-বেশী ক'রে প্রতি ধমনীতে বাজে!
আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি-কে জানে কে আছে
আমাতে মহামহিম।
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদী ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবা-রাতি!
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!
হয়ত ইহারি ঔরসে ভাই ইহারই কুটির-বাসে
জন্মিছে কেহ- জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে!
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখনি,-হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে!
ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হ'তে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল, কাল হ'তে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা ব'লে কর ঘৃণা!
দে'খো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না!
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী-যা আছে র'বে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
সে মার রহিল জমা-
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হ'য়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনখানে!
তোমারি কামনা-রাণী
যুগে যুগে পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি'।

কবি নজরুলের মানুষ কবিতার মর্মবাণী
ধর্মকে আলেম-পুরোহিতদের শৃঙ্খলমুক্ত করার আহ্বান

উম্মুতিজান মাখদুমা পন্নী

পরম করুণাময় স্রষ্টা অতি যত্নের সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষকে এই বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর কর্তৃত্ব দিয়ে প্রেরণ কোরেছেন যেন তারা সুখে শান্তিতে এখানে জীবনযাপন করে। এই পৃথিবী মানুষের জন্য। পৃথিবীতে মহান রব্বুল আলামীন যেসকল নেয়ামত দান কোরেছেন তার সবগুলোই মানুষের জন্য। মানবজাতি এক জাতি। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং অবস্থানের ভিত্তিতে বর্তমানে মানবজাতিকে যেভাবে বিভক্ত কোরে রাখা হোয়েছে তা কখনোই স্রষ্টা চান না। হিন্দু, মোসলেম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি সবাই একই আদম-হাওয়ার সন্তান। একই জায়গা থেকে তাদের উৎপত্তি। মৃত্যুর পর সবাইকে এক আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে যে বিভক্তি করা হোয়েছে তা নিছক গুটি কয়েক লোকের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে। সকল ধর্মই এক স্রষ্টা থেকে আগত, তাই সব ধর্মই একই কথা অর্থাৎ মানবতার কথা বলে। অথচ বর্তমানে ধর্মকে অতি বিশ্লেষণ কোরে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কোরে মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যবর্তী এক মাধ্যম হিসাবে আবির্ভূত হোয়েছে মোল্লা পুরোহিত শ্রেণী। ধর্ম সবার জন্য, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সবার জন্য সমান। বর্তমানে সময় এসেছে এসকল মোল্লা-পুরোহিতদের কবল থেকে ধর্মকে রক্ষা করার। তাই কবি নজরুল বিপ্লবের ডাক দিয়ে বোলেছেন-

তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!
কোথা চেঙ্গিস গজনী-মামুদ, কোথায় কালা পাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যতো তালা-দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!

এদের কূপমণ্ডুকতা এবং ব্যক্তি স্বার্থের কবলে পড়ে বর্তমানে হিন্দুরা দাবি কোরছেন 'ভগবান' তাদের, মোসলেমরা মনে কোরছেন 'আল্লাহ' তাদের, খ্রিস্টানরা মনে কোরছেন 'গড' শুধুই তাদের, ইহুদিরাও মনে করে 'এলী' শুধু তাদের। কিন্তু ভগবান, আল্লাহ, গড এবং এলী যে নামেই ডাকা হোক তিনি মূলতঃ একজনই। তিনি প্রতিটি স্থান এবং কালের জন্য যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্যও এক; আর তা হোল- অন্যায়, অত্যাচার, বিভেদ-ব্যবধান ভুলে এক আদম-হাওয়া দম্পতি থেকে আগত মানবজাতি যেন সুখে ও শান্তিতে বসবাস কোরতে পারে। আর এ জন্যই আদম, দাউদ, ঈসা, মুসা, এব্রাহীম, মোহাম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবীরসহ যত মহামানব পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের ডাক একই ছিল।

আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মাদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর,-বিশ্বের সম্পদ।

কিন্তু তাদের আনীত শিক্ষা এবং আদর্শকে এই ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা পুরোহিতরা অবিকৃত অবস্থায় থাকতে দেয় নি। আজকের ধর্মান্ধদের কাছে সাতদিনের অভুক্ত ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেবার চাইতে নামাজ পড়া বেশি জরুরি, তাদের কাছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের চাইতে মসজিদ, মন্দির বেশি সম্মানিত, যদিও স্রষ্টা মানুষের কল্যাণের জন্যই মসজিদ, মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রসুলের সময় মসজিদ ছিল ধনী-গরীব সব মানুষের আশ্রয়স্থল, সেটা কখনওই তালাবদ্ধ থাকতো না। এই ধর্মান্ধরা গরিবদেরকে ঘৃণা কোরে, মানুষের হক নষ্ট কোরে, মানবতার গলায় বিভক্তির ছুরি চালিয়ে ধর্মগ্রন্থকে চুমু খায়। এরা বুঝতে চায় না যে ঐ ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টা মানুষের জন্যই নাজেল কোরেছেন, মানবতার মুক্তির জন্য দান কোরেছেন। কাজেই মানবতার গলায় ছুরি চালিয়ে যতোই ধর্মগ্রন্থে চুমু খাওয়া হোক না কেন তা যে স্রষ্টার অপছন্দ তা বুঝতে তাদের মতো পণ্ডিত হবার প্রয়োজন নেই, মানুষ হওয়াই যথেষ্ট। তারা বুঝতে পারে না যে, স্রষ্টার কাছে হাজারও মসজিদ, মন্দির, ধর্মগ্রন্থের চাইতে একটা বুভুক্ষু হাড্ডিসার দুর্বল মানুষের দাম অনেক বেশি। কারণ সেই মানুষের মাঝেও তাঁর রূহ বিরাজ করে। সেই মানুষ কষ্ট পেলে তিনিও কষ্ট পান। নজরুল বলেন,

মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি' মরি'
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!

অন্যজীবন ■ আতাহার হোসাইন

কেন তিনি কলেজের শিক্ষকতা ও মসজিদের এমামতি ছাড়লেন?

আমরা সাধারণতঃ পত্রপত্রিকা, টেলিভিশনের মাধ্যমে বহু সফল মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা জানতে পারি। একজনের সফলতা বহুজনকে প্রভাবিত করে। একটি প্রশ্ন চিরন্তন। তা হোল- সফলতা বোলতে আমরা কি বুঝবো? কারও কাছে সফলতা হোল খ্যাতি, কারও কাছে অর্থকড়ি, কারও কাছে পদমর্যাদা, সম্মান। আজ আমরা এমন এক ব্যক্তির গল্প শোনাবো যিনি সফলতার এইসব প্রচলিত মানদণ্ডে বিশ্বাসী নন, বরং সেগুলিকে পায়ে ঠেলে ভিন্নতর এক সফলতার পেছনে নিরন্তর ছুটে চোলেছেন। নীরবে-নিভৃতে চরম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সয়ে তিনি মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে নিজ জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ কোরেছেন। আজ তার ও তার মতো আরও বহু ন্যায়ের সৈনিক অকাতরে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে মানবজাতির মুক্তির লক্ষ্যে কাজ কোরে যাচ্ছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া জাগতিক কোন মূল্যায়নের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না। হয়তো ভবিষ্যৎ কাল সঠিক বিচার কোরে তাদেরকে অসাধারণ মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করবে।

এদেরই একজন মোহাম্মদ আজমল হোসাইন। বাড়ী দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জেলা ঝিনাইদহের মহেশপুর থানাধীন সামন্তা-গোপালপুর গ্রামে। তিনি মহেশপুর ভৈরবা শহীদুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের লেকচারার (Lecturer) ছিলেন। আবার স্থানীয় জামে মসজিদের একজন এমামও ছিলেন। সমাজে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। এগুলো আজ অতীত। কেন, তা শোনা যাক তার মুখ থেকেই:-

আমার জীবনযাপন

"আমার একজন কম্যুনিজমে বিশ্বাসী বন্ধু ছিলো। কম্যুনিজমে বিশ্বাসী হোলেও সে অনেক বিষয়েই পড়াশুনা কোরত। এটা ২০০৪ সালের কথা। আমার ঐ বন্ধুটি সে সময় কোন এক ফুটপাত থেকে স্বল্প দামে একটি বই কিনে এনে আমাকে দেয়। বইটির নাম 'এ ইসলাম ইসলামই নয়'। লেখক জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। প্রথমে বইটি এসলাম-বিরোধী মনে কোরে অবজ্ঞাভরে টেবিলে রেখে দেই। অনেকদিন পর, আমি বিছানায় শুয়েছিলাম। হঠাৎ বইটির দিকে আমার নজর যায়। আমি বইটি পড়তে শুরু কোরি। একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকি, আমার সামনে নতুন একেকটি জগৎ উন্মোচিত হোতে থাকে। আমি অভিভূত হই এবং ভাবতে থাকি, কী সাংঘাতিক সত্য কথাগুলি লেখক এই বইয়ে অকাট্য যুক্তি দিয়ে তুলে ধোরেছেন! আমি বুঝতে পারি যে বর্তমানে এসলামের নামে যা কিছু চোলছে তা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের এসলামের ঠিক বিপরীত একটা এসলাম। আরো বুঝতে পারি বিশেষ কোরে আমাদের মতো যারা মসজিদের এমামতি করেন তাদের ভূমিকা এসলামের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর। কিন্তু এ অবস্থায় আমার করণীয় কী? আমি নিশ্চয় একা একা কিছু কোরতে পারবো না। আমি বুঝতে পারি, এ বইয়ের লেখক কোন সাধারণ মানুষ নন। যেহেতু লেখকের জন্ম ১৯২৫ সালে, তিনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা, থাকলে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ করা সম্ভব কি না। আমি বই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ কোরে একটি চিঠি লিখি। কিন্তু চিঠিটি আমার কাছে ফেরত আসে। খামের উপর লেখা ছিলো "তিনি বর্তমানে এই ঠিকানায় থাকেন না এবং কোথায় থাকেন তা জানা নাই।" এরপর আমার কোন কিছু করার ছিলো না। দীর্ঘ চারটি বছর আমার খুবই মনোকষ্টে আর আত্মপীড়ায় কাটে।

এরপর আবার ঘটে এক ঘটনা। একজন সহকর্মী বাস থেকে একই লেখকের লেখা 'দাজ্জাল? ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'!- নামে একটি বই কিনে আনে। তাকে আমি 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি আগে পড়িয়েছিলাম। বইটি পড়ার পর তার ভেতরও আমার মতই একটি ঝড় বয়ে যায়। আমি দাজ্জাল বইটির প্রচ্ছদে লেখকের নামটি দেখার সাথে সাথে আমার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। আমি এবার হেযবুত তওহীদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরতে সক্ষম হোই এবং জানতে পারি বইয়ের লেখক এখনও বেঁচে আছেন। আমি ঢাকায় এসে হেযবুত তওহীদের এমাম এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সাক্ষাৎ লাভ কোরি এবং তাঁর হাতে আমৃত্যু তওহীদের উপর অটল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার বায়াত নেই।

সেদিন থেকে আমার জীবনধারা বদলে যেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি একজন মো'মেন হিসাবে আমাদের যে দায়িত্ব পালন করার কথা আমরা তা থেকে বহু দূরে অবস্থান কোরছি। উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে আমাদের রসুলের আসহাবগণ যেভাবে নিজেদের ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ কোরে দুনিয়ার বুকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তৎকালীন আরবের একটি অবহেলিত, পশ্চাদপদ জাতি হোয়েও মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে দুনিয়ার বুকে ধনে-বলে, শিক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিকিৎসায়, সামরিক শক্তিতে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হোয়ে গিয়েছিলেন- তাঁদের মতো আমাদেরকেও আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে কোরবান করা উচিত এবং বাধ্যতামূলক। কোন্ শক্তি তখনকার আরবের সাধারণ মানুষগুলির মধ্যে এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো তা আমি বুঝতে পারি যামানার এমামের সংস্পর্শে এসে।

যামানার এমাম যে মহাসত্যগুলি মানবজাতির সামনে প্রকাশ কোরেছেন তার প্রধান বিরোধিতাকারী হোচ্ছে প্রচলিত এসলাম ধর্মের ধর্মজীবী আলেম, মোল্লা শ্রেণী। আল্লাহ ধর্মব্যবসা হারাম কোরেছেন যা এই ধর্মজীবীদের পেশা। তাই এরা হেযবুত তওহীদের সকলকে খ্রিস্টান, কাফের ইত্যাদি ফতোয়া প্রদান কোরে সাধারণ মানুষকে সত্য জানা থেকে ফিরিয়ে রাখে। আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে এই মোল্লা শ্রেণীর নিষ্ঠুরতার শিকার হোতে হোয়েছে। মোল্লাদের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে এমন কি প্রশাসনের কর্মকর্তারাও আমাদেরকে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা দিয়ে ব্যাপকভাবে হয়রানী করে। তারা আমাদের এলাকার বেশ কয়েকজন হেযবুত তওহীদ সদস্যের ঘরবাড়ি ভাংচুর করে। আমাদেরকে ক্ষেত-খামারে কোন কাজ কোরতে দিত না। কোন শুভাকাঙ্ক্ষী পাড়া প্রতিবেশীও যেন আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা কোরতে না পারে এজন্য তার দিকে বিরোধিদের কড়া দৃষ্টি থাকতো। তাদের নির্যাতনে আমরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চোলে যেতে বাধ্য হই। আমার ভুট্টার ক্ষেতে তখন চারাগুলো বড় হোচ্ছে। আমরা যেন সেঁচ

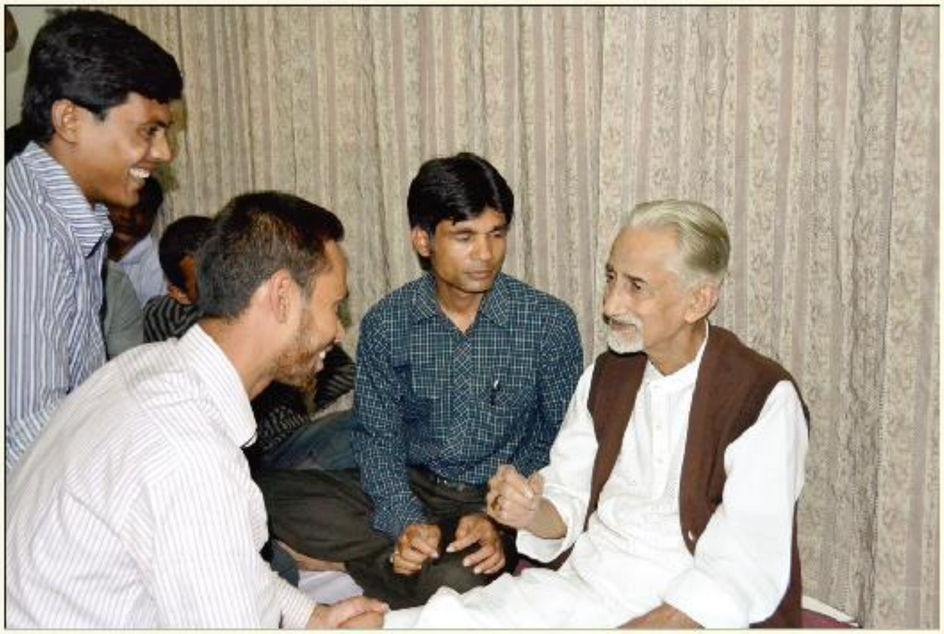

যামানার এমামের সাথে সাক্ষাৎকালে মোহাম্মদ আজমল হোসাইন

দিয়ে পানি না দিতে পারি সেজন্যও তারা পাহারা বসায়। এভাবে ফসলগুলি পানির অভাবে নষ্ট হোয়ে যায়। আমরা পরবর্তীতে থানায় মামলা কোরলে তারা বর্তমানে কিছুটা নমনীয় আচরণ কোরতে বাধ্য হোচ্ছে। বর্তমানে আমি এবং আমার এলাকার সদস্যরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস কোরছি এবং মানুষকে প্রকৃত তওহীদের আহ্বান কোরে যাচ্ছি। আমাদের বক্তব্য বিভিন্ন বই, সিডি, সংবাদপত্র, লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার কোরে বেড়াচ্ছি। জীবনধারণের প্রয়োজনে আমরা যে কোন কাজ কর্ম কোরতে দ্বিধা বোধ করি না। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন হকারী, ছোট খাট ব্যবসা, রিক্সা চালনা ইত্যাদি কাজ-কর্ম কোরে যাচ্ছেন। আমার জীবনও তাদের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। আমরা রসুলের উপর আল্লাহর অর্পিত সারা পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য এবং মানুষকে আল্লাহর তওহীদের বালাগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাড়ি-ঘর সব পেছনে ফেলে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। তাছাড়া আল্লাহর তওহীদের কাজ কোরতে গিয়ে নিয়মিত কলেজে যেতে পারতাম না। দেখলাম দুইটা একসঙ্গে চলে না। আজ আমি যদি জামে মসজিদের এমামতি ও কলেজের অধ্যাপনা কোরে সম্মানের সঙ্গে এবং নিরাপদে ঘাড় গুঁজে জীবন কাটিয়ে যাই, এখানে আমার সন্তানদেরকে অশান্তিময় একটি পৃথিবীর মাঝে রেখে যাবো। সর্বোপরি আখেরাতে আল্লাহর রসুলের সামনে গিয়ে তো দাঁড়াতেই হবে, সেখানে গিয়ে কোন মুখে দাঁড়াবো? এজন্যই আমি সবকিছু ত্যাগ কোরে মানবতার সত্যিকার কল্যাণ সাধনে আমার জীবনকে উৎসর্গ করার চেষ্টা কোরছি। এটা সাধারণ জ্ঞান যে, বিশ্বব্যবস্থাকে পরিবর্তন কোরতে হোলে কিছু মানুষকে অন্তত ঘর-সংসার নিয়ে পড়ে থাকলে চোলবে না, এই অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটনের জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগ ছাড়া সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, আমরা জানি সারা দুনিয়ার জীবনব্যবস্থা পরিবর্তন কোরতে গেলে আমাদেরকে গোটা দুনিয়ার অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরতে হবে, বিশেষ কোরে বর্তমান বস্তুবাদী আত্মাহীন যান্ত্রিক সভ্যতা ও তার অনুসারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো খুব সহজ কাজ নয়, বিশেষ কোরে তারা যখন সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক শক্তিতে আমাদের চেয়ে কোটি গুণ এগিয়ে রোয়েছে! কিন্তু আমরা আমাদের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ কোরে এক মহাসত্য নিয়ে ঘর থেকে বের হোয়েছি এবং মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রোয়েছেন আর আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তাছাড়াও আল্লাহ এক বিরাট মো'জেজা ঘোটিয়ে আমাদেরকে নিশ্চিত কোরেছেন যে এই হেযবুত তওহীদ দিয়ে আবার সারা দুনিয়ায় আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে এনশাল্লাহ।

এমামতি ছাড়লাম কেন?

যামানার এমামের কাছ থেকে জানতে পারি, আল্লাহ বোলেছেন- যারা ধর্মকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে বা দীনের বিনিময় গ্রহণ করে বা ধর্ম বিক্রি কোরে খায় তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই পুরে না। তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা কোরবেন না, তাদের জন্য রোয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি (বাকারা-১৭৪-১৭৫)। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, আগুন খাওয়া থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমি মসজিদের এমামতি ছেড়ে দিলাম। আমি পথহারা, গোমরাহ ছিলাম। খ্রিস্টানদের তৈরি করা বিকৃত বিপরীতমুখী ধর্মটাকেই সঠিক এসলাম মনে করে সেটাকেই প্রাণপণে পালন কোরছিলাম। আল্লাহর অশেষ করুণায় আমার এ সাংঘাতিক ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। এখনও যারা ধর্মব্যবসা কোরছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে আছেন। তার চেয়ে বড় কথা আপনারা অন্যকে জাহান্নামের পথে চালিত কোরছেন। এই পথভ্রষ্টতা থেকে আজই বেরিয়ে আসুন মানবতার কল্যাণে, সত্যপথে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ কোরুন, তবেই মহান আল্লাহ আমাদের উপর থেকে লানৎ উঠিয়ে নিবেন। আমরা আবারও এক শান্তিময় পরিবেশে ফিরে যাবো, যেখানে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি থাকবে না।

বিশেষ কলাম

এস.এম.সামসুল হুদা

এসলাম (শান্তি) প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত কর্মসূচি

বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলায় লাখো মানুষের ভিড়ে ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করার জন্য যামানার এমামের বই বিক্রয় কোরছেন হেযবুত তওহীদের সদস্যরা। এটা শুধু প্রচার নয়, এটা সংগ্রাম, জেহাদ।

আল্লাহর রসুল যে কর্মসূচি অনুসরণ কোরেছেন

বিগত তেরশত বছরে ক্রমাগত বিকৃত হোতে হোতে সে এসলাম বর্তমানে ঠিক এর বিপরীত একটি ধর্ম-বিশ্বাসে রূপান্তরিত হোয়ে গেছে। বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে এই এসলাম আল্লাহ রসুলের এসলামের মত হোলেও চরিত্রে, আত্মায় ঠিক এর বিপরীত। শেষ রসুল আনীত প্রকৃত এসলাম মানুষকে দিয়েছিল সর্বরকম মুক্তি ও স্বাধীনতা, নির্মূল কোরেছিল সমস্ত অন্যায়-অবিচার, সামাজিকভাবে দিয়েছিল পরম নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দূর কোরেছিল বৈষম্য। কিন্তু বর্তমানে সে এসলাম আর আমাদের মাঝে নেই। ধর্ম ব্যবসায়ী ও পণ্ডিতদের কবলে পড়ে এসলাম আজ নামাজ রোজাসর্বস্ব অন্যান্য ধর্মের মত একটি ধর্মে পরিণত হোয়ে গেছে। সর্বশেষ ব্রিটিশরা তাদের তৈরি মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতির মন মগজে এক মৃত এসলাম গেঁড়ে দিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এই জাতিকে যদি পৃথিবীর বুকে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়, সম্মান নিয়ে বাঁচতে হয়, শান্তি ও সমৃদ্ধ পৃথিবী পেতে হয় এবং মৃত্যুর পরে জান্নাতে যেতে হয় তাহোলে আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত এসলাম প্রতিষ্ঠা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ দয়া কোরে সেই প্রকৃত এসলাম যামানার এমাম, এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন মানবজাতির কর্তব্য হোচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সত্য এসলামটাকে মেনে নেওয়া। এ ছাড়া মানবজাতির সামনে অন্য কোন পথ অবশিষ্ট নেই। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি অপরিহার্য্য। একটি জীবনব্যবস্থা দিলেন আল্লাহ আর সেটি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি তৈরি কোরবে মানুষ সেটা কখনই হোতে পারে না। আল্লাহর রসুল এবং তাঁর উম্মাহ কি অর্ধ-পৃথিবীতে নিজেদের তৈরি কর্মসূচি দিয়ে দীন প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। তাহোলে কোথায় সেই কর্মসূচি? মহান আল্লাহ অসীম করুণা কোরে, ভালবেসে তাঁর নিজের তৈরি করা সেই পবিত্র কর্মসূচি এ যামানার এমামকে নতুন কোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার রসুলকে সঠিক পথ প্রর্দশন (হেদায়াহ) এবং সত্যদীন দিয়ে প্রেরণ কোরলাম এই জন্যে যে তিনি যেন একে (এই হেদায়াহ ও জীবন ব্যবস্থাকে) পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন (কোর'আন-সুরা আল্ ফাতাহ- ২৮, সুরা আত তওবা- ৩৩ ও সুরা আস সফ- ৯)। অর্থাৎ পৃথিবীতে, মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর রসুলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হোচ্ছে রসুলের মাধ্যমে হেদায়াহ, পথ প্রদর্শনসহ দীন পাঠানো এবং সেই হেদায়াহ ও দীনকে সমগ্র মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তাঁর রসুলকে এই কাজ করার নীতি ও কর্মসূচিও দান কোরলেন। সেই নীতি হোচ্ছে, সংগ্রাম, জেহাদ কোরে এই সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- আমি আদিষ্ট হোয়েছি মানব জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম (কেতাল) চালিয়ে যেতে যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মানুষ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ এবং আমাকে তাঁর রসুল বোলে মেনে নেয় (হাদীস- আবদাল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে- বোখারী, মেশকাত)।

এসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরতে আল্লাহ যে নীতি রসুলকে দিয়েছেন সেই নীতির উপর ভিত্তি করা একটি ৫ দফা কর্মসূচি আল্লাহ তাঁর রসুলকে দান কোরলেন। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বোলছেন– এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, (আমি সারাজীবন এই কর্মসূচি অনুযায়ী সংগ্রাম কোরেছি) এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ কোরে আমি চোলে যাচ্ছি। সেগুলো হোল :

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।
(২) (নেতার আদেশ) শোন।
(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।
(৪) হেজরত করো।
(৫) (এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হোল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে এসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেললো- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের (কোনও কিছুর) দিকে আহ্বান কোরলো, সে নিজেকে মোসলেম বোলে বিশ্বাস কোরলেও, নামায পোড়লেও এবং রোযা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বনবীর ওফাতের ৬০/৭০ বৎসর পর এবলিস এই উম্মাহর আকীদায় বিকৃতি ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হোল। যার ফলে এই জাতি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও ঐ ৫ দফা কর্মসূচি দু'টোই ত্যাগ কোরে এসলাম ও উম্মতে মোহাম্মদী দু'টো থেকেই বহিস্কৃত হোয়ে গেল। সেই থেকে এই কর্মসূচি যে পরিত্যক্ত হোয়েছিলো এই তেরশ' বছর ওটা পরিত্যক্ত হোয়েই ছিলো। হাদীসের বইগুলিতে কর্মসূচির ঐ হাদীসটি যথাস্থানেই আছে। এই তেরশ' বছরে এটি লক্ষ-কোটিবার পড়া হোয়েছে, পোড়েছেন লক্ষ লক্ষ আলেম, ফকিহ, মুফাসসের, মোহাদ্দেস, শায়েখ, দরবেশরা, কিন্তু বোঝেন নি যে এটি এই উম্মাহর জন্য স্রষ্টার দেয়া একমাত্র কর্মসূচি-তরিকা। গত কয়েক শতাব্দিতে এই দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মোসলেম দেশগুলিতে শত শত দল, আন্দোলন, সংগঠন করা হোয়েছে, কিন্তু আকীদার বিকৃতির কারণে আল্লাহ তাদেরকে ঐ কর্মসূচি বুঝতে দেন নি। ফলে ঐ সব সংগঠনগুলি বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন দফার কর্মসূচি নিজেরা তৈরি কোরে নিয়েছে। কোথাও কেউ সাফল্য লাভ করে নি, পৃথিবীর এক ইঞ্চি জমিতেও তারা এসলামকে প্রতিষ্ঠা কোরতে পারেন নি। কারণ সবগুলোরই কর্মসূচি মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত, আল্লাহর দেয়া নয়। ফলে তাদের ঐ প্রচেষ্টায় আল্লাহর কোন সাহায্য আসে নি।

আল্লাহর দেয়া এই ৫ দফা কমসূচির ব্যাখ্যা

প্রথম দায়িত্ব - ঐক্যবদ্ধ হওয়াঃ

কারণ ঐক্য ছাড়া কোন অভীষ্ট, কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কোন জাতি বা রাষ্ট্র যদি ধনবলে, লোকবলে, সামরিক বলে যতই শক্তিশালী হোক সেটা তার অভীষ্ট কাজে সক্ষম হবে না, তারচেয়ে অনেক দুর্বল ঐক্যবদ্ধ শত্রুর কাছেও পরাজিত হবে। যেমন বর্তমান মোসলেম নামক জনসংখ্যা। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর কোর'আনে বারবার সুদৃঢ় ঐক্যের কথা বোলেছেন, সুরা আল এমরানের ১০৩ নং আয়াতে বোলেছেন- ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আল্লাহর রজ্জু (হেদায়াহ, দীন) ধোরে রাখতে, বিচ্ছিন্ন না হোতে; সুরা সফ-এর ৪ নং আয়াতে আবার বোলেছেন, 'আল্লাহ তাদেরকে কতই ভালোবাসেন যারা গলিত সীসার প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। যে সব কাজে ও কথায় উম্মাহর ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে যেমন মতভেদ, গীবত ইত্যাদি সে সব কাজকে আল্লাহর রসুল সরাসরি কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন। বর্তমানে ১৫০ কোটির মোসলেম নামধারী জনসংখ্যাটি বহু ভৌগোলিক রাষ্ট্রে, রাজনৈতিকভাবে বহু মতাদর্শে বিভক্ত। ধর্মীয়ভাবে বহু ফেরকা, মাজহাব, আধ্যাত্মিকভাবে শত শত তরীকায় ছিন্নভিন্ন। আজ একমাত্র হেযবুত তওহীদ এই শতধাবিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কোরে একটি মহাজাতিতে পরিণত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দায়িত্ব - (নেতার আদেশ) শোনাঃ

সতর্কতার সাথে কোন বিষয়ে সদা, সর্বদা সচেতন হোয়ে থাকা বোঝায়। এখানে এই সচেতনতা হোচ্ছে দু'টি বিষয়ে। একটি নেতার আদেশ শোনার প্রতি সদা সর্বদা কান খাঁড়া কোরে রাখা, আমীরের কখন কি আদেশ হয় তা তৎক্ষণাৎ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং অপরটি নিজেদের শৃংখলা অটুট রাখা। মানবজাতিকে সত্যিকারভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি অপরিহার্য্য তা হোল, তাদেরকে একক নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা, এতে কোরে সকলেই একই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন অতিবাহিত কোরতে সক্ষম হবে। সৃষ্টিজগতে যেমন বিধাতা একজন হওয়ায় কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই, তেমনি সমগ্র মানবজাতিতে যখন একজন মাত্র নেতা থাকবেন তখন মানবসমাজেও প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বপ্রকৃতির ন্যায় অতুলনীয় শৃঙ্খলা, সঙ্গতি ও সমন্বয় *(Discipline, order & harmony)*।

তৃতীয় দায়িত্ব - (নেতার ঐ আদেশের) আনুগত্য করাঃ

কর্মসূচির অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোচ্ছে আনুগত্য। এই দীনে আনুগত্য হোল, আদেশ শোনামাত্র বিন্দুমাত্র ইতস্তত না কোরে সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ পালন করা। আনুগত্য হোচ্ছে একটি পরিবার, গোষ্ঠী বা জাতির মেরুদণ্ড, এটা যেখানে দুর্বল সেখানেই অক্ষমতা এবং ব্যর্থতা। এ নির্দেশ শুধু রসুলেরই নয়, এ নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর। তিনি কোর'আনে মো'মেন, উম্মতে মোহাম্মদীকে আদেশ কোরেছেন– আল্লাহর আনুগত্য করো, তাঁর রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে আদেশকারীর (নেতার) আনুগত্য করো (সুরা নেসা ৫৯)।

আনুগত্য হোচ্ছে শান্তির মূলমন্ত্র, আল্লাহর আনুগত্যই এসলাম, এসলাম মানেই শান্তি। আজকের পৃথিবীতে কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যখনই তার জাতিকে কোন আদেশ বা বিধান দেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এর বিরুদ্ধাচারণ ও সমালোচনা। কিন্তু এসলামের বেলায় আল্লাহর কোন আদেশের ব্যাপারে মতান্তর বা বিরোধিতার প্রশ্ন অবান্তর তেমনি আল্লাহর রসুলের নির্দেশ হোচ্ছে, 'কোন ক্ষুদ্রবুদ্ধি, কান কাটা, নিগ্রো, ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা নিয়োজিত হয়, তবে তার কথা বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় শুনতে ও মানতে হবে।' কারণ নেতার আদেশ প্রকারান্তরে আল্লাহরই আদেশ।

চতুর্থ দায়িত্ব - হেজরত

হেজরত শব্দের অর্থ শুধু দেশ ত্যাগ করা নয়। হেজরত শব্দের অর্থঃ- "সম্পর্কচ্ছেদ করা, দল বর্জন করা, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে গমন করা" (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৬০-৬১, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)। আল্লাহয় বিশ্বাসী অথচ মোশরেক আরবদের মধ্যে আবির্ভূত হোয়ে বিশ্বনবী যখন প্রকৃত তওহীদের ডাক

দিলেন তখন যারা তাঁর সাথে যোগ দিলেন তারা আরবদের ঐ শেরক ও কুফর থেকে হেজরত কোরলেন। তারা মোশরেক কাফেরদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, ওঠা-বসা সবই কোরতেন কিন্তু তাদের মধ্যে বাস কোরেও হৃদয়ের দিক থেকে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কোরলেন, তাদের দল বর্জন কোরলেন, তাদের সাথে এবাদত করা ছেড়ে দিলেন এবং আল্লাহর রসুলকে কেন্দ্র কোরে তওহীদ ভিত্তিক একটি আলাদা সমাজ, আলাদা ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুললেন। ১৩ বছর পর মক্কা থেকে মদীনায় যেয়ে তৃতীয় প্রকার হেজরত কোরলেন। মক্কা জয়ের পর এই তৃতীয় প্রকারের হেজরতের আর প্রয়োজন রোইলো না, কিন্তু বাকী দুই প্রকারের হেজরতের প্রয়োজন রোয়ে গেলো এবং আজও আছে। দীন যখনই বিকৃত হোয়ে যাবে, বৃহত্তর জনসংখ্যা যখনই ঐ বিকৃত দীনের ভ্রান্ত পথে চোলবে, তখন আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় যাদের সেরাতুল মুস্তাকীমে হেদায়াত কোরবেন, তাদের ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ পথভ্রান্তদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের দল বর্জন কোরতে হবে। চৌদ্দশ' বছর আগে আল্লাহতে বিশ্বাসী আরবের মোশরেকদের মধ্যে মহানবী ও তাঁর আসহাবদের যে ভূমিকা ছিলো, আজ আল্লাহ বিশ্বাসী কিন্তু কার্য্যতঃ মোশরেক সমাজের মধ্যে হেযবুত তওহীদের সেই ভূমিকা। সেদিন আল্লাহর রসুল যেমন মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত তওহীদে, সর্বব্যাপী তওহীদে আহ্বান কোরেছিলেন, সেই নবীর প্রকৃত উম্মাহ হিসাবে হেযবুত তওহীদ সেই একই আহ্বান কোরছে। সেদিন আল্লাহর রসুল ও তাঁর আসহাবগণ যেমন দীনের ব্যাপারে ঐ সমাজ থেকে হেজরত কোরেছিলেন, তাদের সাথে এবাদত করা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ ঠিক তেমনিভাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী হবার প্রচেষ্টারত হেযবুত তওহীদও বর্তমান 'মোসলেম' কিন্তু কার্যতঃ কাফের মোশরেক সমাজ থেকে ধর্মীয় সকল এবাদতের ব্যাপারে হেজরত কোরেছে। রসুলাল্লাহর সময়ে তিনি ও তাঁর আসহাবগণ মক্কা থেকে হেজরত কোরে মদীনাতে গিয়েছিলেন, সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন। কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপট সে সময় থেকে একটু ভিন্ন। বর্তমানে সারা পৃথিবী দাজ্জালের পদতলে। হেজরত কোরে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। দাজ্জালের করতলে থেকেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হোচ্ছে হেযবুত তওহীদকে।

পঞ্চম দায়িত্ব - আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা:

কর্মসূচির প্রথম চারটি দায়িত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হোল জেহাদ করা। জেহাদ বাদ দিয়ে ঐ চারটি পালন করা অর্থহীন। একটি সংবিধান (Constitution), সেটি যতো সুন্দর, নিখুঁতই হোক না কেন, সেটা একটা জনসমষ্টি বা জাতির ওপর প্রয়োগ ও কার্য্যকর না করা হোলে যেমন সেটা অর্থহীন, তেমনি তওহীদের ওপর ভিত্তি করা দীনুল হকের সংবিধান "কোর'আনকে" মানব জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে কার্য্যকর না কোরতে পারলে তা অর্থহীন। এই সংবিধানকে প্রয়োগ ও কার্য্যকর করার নীতি পদ্ধতি আল্লাহ নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছেন- জেহাদ ও কেতাল- সর্বাত্মক সংগ্রাম (সুরা বাকারা- ২১৬ ও অন্যান্য বহু আয়াত)। তাই মো'মেনদের অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসীদের সংজ্ঞাকে আল্লাহ শুধু সর্বব্যাপী তওহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, ঐ তওহীদকে প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যকর করার জন্য জেহাদকেও অন্তর্ভুক্ত কোরে দিয়েছেন। বোলেছেন- শুধু তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে বিশ্বাস কোরেছে, তারপর আর তাতে কখনও সন্দেহ করে নি এবং তাদের জান ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কোরেছে (সুরা হুজরাত- ১৫)।

দীর্ঘ তেরশ' বছর এই উম্মাহকে এই পবিত্র কর্মসূচি থেকে মাহরুম, বঞ্চিত রাখার পর রাহমানুর রহিম আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় তাঁর দেয়া কর্মসূচির পরিচয় এলহামের মাধ্যমে মাননীয় এমামুয্যামানের হৃদয়ে নাযেল কোরেছেন। আল্লাহর এতবড় অনুগ্রহ থেকেই প্রমাণ হয় যে এটাই তাঁর নিজের আন্দোলন। তিনি চান এই আন্দোলনের নেতৃত্বেই পৃথিবীর সমস্ত মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রাম - জেহাদ করে।

মো'মেনের সংজ্ঞা কি?

মো'মেন শব্দটি এসেছে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস থেকে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ মো'মেনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

"তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনে এবং আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ (সুরা হুজরাত ১৫)।

আল্লাহর দেয়া প্রকৃত মো'মেনের এই সংজ্ঞাটা ঠিক ভাবে বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে "যারা আল্লাহর ওপর ঈমানে"র অর্থ শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বের ওপর ঈমান নয়, তাঁর উলুহিয়াতের ওপর, সার্বভৌমত্বের ওপর (Sovereignty) ঈমান, লা এলাহা এল্লা আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন আদেশদাতা, হুকুমদাতা নেই এই বিশ্বাস করা অর্থাৎ তওহীদ।

আল্লাহর দেয়া মো'মেনের এই সংজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ হোল প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করা। কি জন্য জেহাদ করা? আল্লাহর তওহীদের, সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনটি যদি মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা, কার্যকর না হয় তবে ওটা অর্থহীন। কাজেই আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক ঐ দীনুল হক, সত্য জীবন-ব্যবস্থাটা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, জেহাদ। এই দু'টি একত্রে প্রকৃত মো'মেনের সংজ্ঞা। এই দু'টি যার মধ্যে আছে, আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞা মোতাবেক সে প্রকৃত মো'মেন। এই সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেন নি, যে সালাহ পড়বে সে মো'মেন, বা যে রোযা রাখবে সে মো'মেন, বা যে হজ্ব কোরবে, বা অন্য যে কোন পূণ্য, সওয়াবের কাজ কোরবে সে মো'মেন। এ সংজ্ঞায় শুধু আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত রকম প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব অস্বীকার ও আল্লাহর পথে জেহাদ। এর ঠিক বিপরীতে তিনি এ সতর্কবাণীও বোলেছেন যে এ তওহীদে যে বা যারা থাকবে না, যারা তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের যে কোন একটি ভাগে, অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা নিজেদের তৈরি আইন-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগ কোরবে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এলাহ বা সার্বভৌম হুকুমদাতা হিসাবে মানবে তারা শেরক কোরবে। আর শেরক ক্ষমা না করার জন্য আল্লাহ অঙ্গীকারাবদ্ধ (কোর'আন- সুরা নেসা ৪৮)।

মহান আল্লাহ মো'মেনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আজ সারা পৃথিবীতে সেই সংজ্ঞা মোতাবেক মো'মেন আছে? নেই। আর মো'মেন নয় মানেই কাফের মোশরেক।

মহান আল্লাহ মো'মেনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আজ সারা পৃথিবীতে সেই সংজ্ঞা মোতাবেক মো'মেন আছে? নেই। আর মো'মেন নয় মানেই কাফের মোশরেক।

খোলা কলাম ▌ আতাহার হোসাইন

তারা পশুর ন্যায় বরং আরো নিকৃষ্ট

▌ভাবনার খোরাক▌

মানুষদের মধ্যে যারা জাহান্নামের উপযুক্ত তাদের সম্বন্ধে বোলতে গিয়ে আল্লাহ কোর'আনে বোলছেন, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর (সুরা আল আরাফ-১৭৯)। মানুষ সম্বন্ধে বোলতে গিয়ে মানুষকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে মানুষ পশুর ন্যায়। কিন্তু আল্লাহ এখানেই না থেমে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বোললেন, 'না, তারা পশুর চেয়েও অধম।' মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর এই বক্তব্যটি একটি সাংঘাতিক কথা, খুবই সাংঘাতিক কথা। এই মারাত্মক কথাটি বলার কারণ এই যে, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর খলিফা হিসেবে। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করাই তার একমাত্র কাজ। এটাই তার এবাদত। এই এবাদত কোরলেই সে দুনিয়াতে থাকবে শান্তিতে এবং আখেরাতে পাবে জান্নাত। এ কাজের জন্যই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি কোরেছেন। আল্লাহ চন্দ্রকে সৃষ্টি কোরেছেন নির্ধারিত একটি কাজে, সূর্যকে সৃষ্টি কোরেছেন অন্য আরেকটি কাজে। এছাড়াও তিনি আরো অসংখ্য বস্তু ও প্রাণী সৃষ্টি কোরেছেন। এসবের যার যার উপরে অর্পিত কাজ কোরে যাওয়াই তাদের যার যার এবাদত। এই এবাদত থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে মানুষকে তিনি সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। অন্যান্য সৃষ্টিকে তিনি সৃষ্টি কোরেছেন 'কুন' 'হও' এই আদেশ দ্বারা। কিন্তু মানুষকে তিনি সৃষ্টি কোরেছেন নিজ হাতে। এরপর তিনি আদমের ভেতরে তাঁর রুহ্ ফুঁকে দিলেন। এই দুটি বিশেষ কারণে আদম অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হোয়ে গেল। তার ভেতরে আল্লাহর সমস্ত সিফত অর্থাৎ গুণসমূহ প্রবেশ কোরল। যদিও তা পরিমাণে খুবই সামান্য।

এখন কথা হোল এই আদম অর্থাৎ মানবজাতি আল্লাহর রুহ অর্থাৎ আল্লাহর আমানত গ্রহণ কোরে তারা অন্যান্য প্রাণী বা পশুর ন্যায় জীবন-যাপন কোরবে তা মোটেই উচিৎ নয়। কিন্তু মানুষ তাই কোরছে। যেমন গরু একটি পশু। গরু ঘাস খায়, মানুষ ভাত, রুটি ইত্যাদি খাবার খায়। মানুষ প্রস্রাব পায়খানা করে, গরুও তাই করে। গরু বংশবৃদ্ধি করে, মানুষও বংশবৃদ্ধি করে। গরু এদিক ওদিক চোড়ে ঘাস খায়, মানুষ রোজগার করে খাবার যোগাড় করে কিংবা চাষ-বাস করে। একটা সময় পরিণত বয়সে গরু মৃত্যুবরণ করে, পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যায়। মানুষের বেলায়ও অনুরূপ হয়। এই হিসেবে দেখা যায় মানুষ এবং গরু অর্থাৎ পশুর সাথে তেমন কোন ব্যবাধান নেই। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আসমান জমিন ব্যবধান এসে যায়। আর তা হোল মানুষের ভেতর আল্লাহ্র রুহ্ আছে, অন্যদের ক্ষেত্রে তা নেই। আল্লাহ মানুষের ভেতর রুহ দিলেন এই জন্য যে তারা যেন আল্লাহর রুহকে ধারণ কোরে আল্লাহর পৃথিবীতে তাঁরই হোয়ে খেলাফত করে। এই খেলাফত কোরলে দুনিয়ায় ন্যায় ও সুবিচার অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, অশান্তি হবে না। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর এই আমানত গ্রহণ কোরেও আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করে না, পশুর মত খেয়ে পরে বেঁচে থাকে, ডানে বামে তাকায় না, একটু চিন্তাও করে না, তখন সে আসলেই পশুর থেকে নিচে নেমে যায়। আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এই কথাটিই পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন। হেযবুত তওহীদ মানুষকে, বিশেষ কোরে মোসলেম নামক এই জাতিকে দীর্ঘ আঠারো বছর যাবত এই কথাটিই বোলে আসছে যে আখেরী নবীর যারা উম্মাহ, যারা নিজেদেরকে মো'মেন, মোসলেম এবং উম্মতে মোহাম্মদী দাবি করে, তারা নিজেরা দুনিয়ায় শান্তিতে তো থাকবেই, সেই সাথে দুনিয়ার আর সব কিছুকে

হেযবুত তওহীদ বোলেছে যে, দেখো! সারা দুনিয়ায় অন্যান্য জাতি তোমাদেরকে মারছে, কাটছে, পিটাচ্ছে, নির্যাতন কোরছে, তোমাদের মেয়েদেরকে ধর্ষণ কোরছে, মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে, দেশ থেকে বের কোরে দিচ্ছে, সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এর কারণ তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব কোরছ না, তাঁর হুকুম পালন কোরছ না। তোমাদের রসুল তোমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, তা তোমরা ত্যাগ কোরেছ। এ জাতি যদি আবার আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করে তবে আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহ এ জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি, সম্মানিত জাতি হিসেবে আবার অধিষ্ঠিত কোরে দেবেন।

সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কোরবে। আল্লাহর রসুল এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই জাতিকে গঠন কোরেছেন। এই জাতিকে হেযবুত তওহীদ বোলেছে যে, দেখো! সারা দুনিয়ায় অন্যান্য জাতি তোমাদেরকে মারছে, কাটছে, পিটাচ্ছে, নির্যাতন কোরছে, তোমাদের মেয়েদেরকে ধর্ষণ কোরছে, মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে, দেশ থেকে বের কোরে দিচ্ছে, সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এর কারণ তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব কোরছ না, তাঁর হুকুম পালন কোরছ না। তোমাদের রসুল তোমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, তা তোমরা ত্যাগ কোরেছ। এ জাতি যদি আবার আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করে তবে আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহ এ জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি, সম্মানিত জাতি হিসেবে আবার অধিষ্ঠিত কোরে দেবেন। আল্লাহ বোলেছেন, তোমরা যদি সংগ্রামে না বের হও তাহলে আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে কঠিন আযাব দেব, অন্য জাতির গোলাম বানিয়ে দেব এবং আখেরাতেও রোয়েছে কঠিন আযাব (সুরা তওবাহ-৩৮-৩৯)। তাই আমরা তাঁর হুকুম বাদ দেওয়ায় তাঁর ঘোষণা মোতাবেক অন্য জাতির গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন। এই জাতি বর্তমানে আর মো'মেনও নেই মোসলেমও নেই, উম্মতে মোহাম্মদী তো দূরের কথা। অন্য জাতিরা আমাদেরকে সারা দুনিয়াতে যে যেভাবে পারছে মারছে, পিটাচ্ছে, নির্যাতন কোরছে, আমরা কিছুই কোরতে পারছি না। হেযবুত তওহীদ বোলছে, এ জাতি যদি আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করে তবে আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহ এ জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি, সম্মানিত জাতি হিসেবে আবার অধিষ্ঠিত কোরে দেবেন। কিন্তু এ কথা বোঝানো হোলেও এ জাতির এ বোধ নেই। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় আসলে কিছুই হয় নি। তারা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে-দাচ্ছে, চাকরি কোরছে, ব্যবসা-বাণিজ্য কোরছে। তাদের আচরণ যেন মহান আল্লাহর কথার বাস্তবায়ন- তারা পশু, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ বোলছেন, তাদের কান আছে কিন্তু শোনে না, চোখ আছে কিন্তু দেখে না, অন্তর আছে কিন্তু উপলব্ধি করে না। পশুকে যেমন পেটানো হোলেও সে বোঝে না তাকে কেন পেটানো হোচ্ছে, তেমনি তারা বুঝতে পারছে না কেন তাদের এই দুর্গতি। আল্লাহর দেওয়া লানতের কারণে তাদের আক্কলবোধও উঠে গেছে। এমতাবস্থায় হেযবুত তওহীদ তাদেরকে স্মরণ কোরিয়ে দিতে চাইছে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য, সঠিক উদ্দেশ্য। হেযবুত তওহীদ তাদেরকে ফিরে পেতে ডাকছে তাদের অতীত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব। যারা আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালন কোরবে তারাই হবেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তারাই হবে আশরাফুল মাখলুকাত। আর যারা তা করে না, তারাই পশু, বরং তার চেয়ে নিকৃষ্ট।

সত্য বলার জ্বালা

বাস্তবতার মুখোমুখী

রাকিব আল হাসান

আরবিতে একটি কথা আছে, "আল হাক্কু মুররুন" অর্থাৎ হক বা সত্য কথা তিতা। সত্য কথা শ্রোতার কাছে তিতা, তবে সত্য বলার জ্বালাও কম নয়। তবু সত্য বোলতেই হবে, প্রকাশ কোরতেই হবে, কারণ সত্য ছাড়া মুক্তি নাই। সত্য বলার জ্বালাটি কেমন সেটা ব্যক্ত করা দরকার। আমরা হেযবুত তওহীদ যতই মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, এসলাম এসেছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলের জন্য আসে নি কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারি না। বরং ধর্ম ব্যবসায়ীরা যান চটে, কারণ সত্য বোললে তাদের ব্যবসায়ের পুঁজি ধোরে টান পড়ে। তারা সাধারণ জনতাকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেন, আমাদের জ্বালা বাড়ে, সত্য বলার জ্বালা। এখানে শেষ হোলেও কথা ছিল, কিন্তু না, এতেও তারা ক্ষান্ত না হোয়ে আমাদেরকে মুরতাদ, ধর্মদ্রোহী, খ্রিস্টান ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে ধর্মপ্রাণ সাধারণ জনতাকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন এই বোলে যে, ধর্ম গেল, ধর্ম গেল। আবার অনবরত হুমকি দিতে থাকেন শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির এমনকি জীবননাশেরও, শুধু যে নিছক হুমকি তাই নয়, সুযোগ পেলে তাদের তাম্বুলচর্চিত, মরিচাপড়া বিষদাঁত দিয়ে ছোবলও মারেন।

এতো গেল ধর্ম ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্বালা। আরও জ্বালা আছে। আমরা যখন বলি, আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো বিশাল, প্রচণ্ড গতিশীল, প্রগতিশীল এই দীনটা এসেছে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে, সকল অন্যায়-অবিচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-বিদ্বেষ এক কথায় সর্বরকম অশান্তি দূর কোরে দিয়ে মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরতে; এটা মসজিদে, হুজরায়, খানকায়, আস্তানায় বোসে চোখ বন্ধ কোরে রিপু জয়ী সাধু সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য আসে নাই। ব্যাস, ক্ষিপ্ত হোয়ে যান পীর সাহেব, সন্ন্যাসীরা। বাড়ে আমাদের আরেক জ্বালা। তারা তাদের অনুসারী, অনুগতদের ফতোয়া দিয়ে বসেন, এরা এসলামের শত্রু, এরা কাফের, এদের যেখানে পাবে ইচ্ছামতো ঠেঙ্গানি দিয়ে দেবে। অমনি তাদের অনুসারীরা দূরবীন নিয়ে খোঁজা শুরু করেন আমাদের, বাগে পেলেই বুঝিয়ে দেন সত্য বলার কী জ্বালা। কিন্তু কী কোরব, সত্য যে বোলতেই হয়। আবার যখন বলি, রাজনীতির নামে এই যে প্রতারণা, রাজনীতির নামে বর্তমানে যে ব্যবসা চোলছে এটা উচিত নয়। মানবতার কল্যাণে যারা নেতৃত্ব দিবেন, তাদের নেতৃত্বের প্রতি কোন লোভ থাকার কথা নয়, মানুষই ডেকে এনে তাদেরকে ক্ষমতায় বসাবে, তারা ঐ চেয়ারে বোসতে বাধ্য হবেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তারা ঠিকমতো ঘুমাতে পারবে না, জনগণের জীবন, সম্পদ পাহারা দিবেন। তারা স্রষ্টার দেওয়া বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কোরবেন, তারা মানুষের সম্পদকে নিজের সম্পদ বোলে কুক্ষিগত কোরবেন না। যারা নিজেদের ঢোল নিজেরা পেটায়,

নিজেদের জন্য ভোটভিক্ষা করে এবং সময়মতো পেশিশক্তি খাটিয়ে ক্ষমতা হস্তগত কোরতে চায় তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নয়, তারা দ্বিপদ বিশিষ্ট একপ্রকার পশু, তারা সাধারণ জনতাকে নিয়ে ব্যবসা করে, তারা ব্যবসায়ী আর তাদের পণ্য গণতন্ত্র। এগুলি সত্য যা রাজনীতিকদের কাছে তিক্তস্বাদের। ব্যাস, শুরু হয় আমাদের আরেক জ্বালা। এই অসৎ, অসাধু এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে শুরু হয় হুমকি-ধামকি, তাদের পোষা কিছু 'প্রাণী'-কে লেলিয়ে দেয় আমাদের পেছনে, শুরু হয় আমাদের আরেক জ্বালা। আবার ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে পুলিশ-র‍্যাবকে পাঠায় আমাদেরকে গ্রেফতার কোরতে, সত্য বলায় আমাদের নামের পাশে যুক্ত হয় একটি বিশেষণ সেটা হোল- 'জঙ্গী', যদিও আমরা এ জাতীয় শব্দের ধারেকাছেও নেই। এখন রাজনীতিক যদি ক্ষমতাসীন দলের হন তাহলে কোন কথাই নেই, আমার ঠিকানা হবে লালদালান। জীবনে যেন আমি আলোর মুখ দেখতে না পাই বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মামলা লাগিয়ে দেওয়া হবে। আর সে ক্ষিপ্ত রাজনীতিক যদি ক্ষমাসীন দলের না হন তাহোলে থানা-পুলিশ না কোরে রাস্তায় পেটোয়াবাহিনী লাগিয়ে হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেওয়ার বন্দোবস্ত কোরবেন। জ্বালার ওপর জ্বালা।

> ***মানবতার কল্যাণে যারা নেতৃত্ব দিবেন, তাদের নেতৃত্বের প্রতি কোন লোভ থাকার কথা নয়, মানুষই ডেকে এনে তাদেরকে ক্ষমতায় বসাবে, তারা ঐ চেয়ারে বোসতে বাধ্য হবেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তারা ঠিকমতো ঘুমাতে পারবে না, জনগণের জীবন, সম্পদ পাহারা দিবেন। তারা স্রষ্টার দেওয়া বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কোরবেন।***

কিন্তু জ্বালা যতই হোক সত্যপ্রকাশ না কোরে বাঁচবো কি কোরে? যারা মিথ্যার ব্যাপারী, সত্যের আমদানী দেখে তাদের গা-জ্বালা কোরবেই, এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই মিথ্যার ব্যাপারীদের উদ্দেশ্যে একটা গল্প শোনাই। ছোটবেলায় দেখতাম, কোন কোন চর্মরোগের জ্বালাপোড়ায় যখন দিনরাত অস্থির থাকতাম তখন দাদীমা এক ধরনের গাছের পাতার (যেমন নিম পাতা) রস দিয়ে গোসল করাতেন। যখনই ঐ রস একটুখানি মুখে যেত তখনই দাদীমাকে বকাবকি শুরু কোরতাম। বুঝতাম না যে এই প্রচণ্ড তিতা রসটিই আমার রোগটি সারিয়ে তুলবে আর দাদীমা কষ্ট কোরে এই পাতা বেটে আমাকে গোসল করাচ্ছেন নিঃস্বার্থভাবে আমাকে শুধু ভালবেসে, আমি যেন ঠিকমত ঘুমাতে পারি। আবার ঐ পাতা দিয়ে বড়ি বানিয়ে ভাতের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাওয়াতেন, যখনই বুঝতাম ভাতের মধ্যে প্রচণ্ড তিতা রোয়েছে তখনই দাদীমার বিরুদ্ধে যেতাম ক্ষেপে। কিন্তু দাদীমাও নাছোড়বান্দা। শত বকাবকি আর নাতীর অত্যাচারেও তিনি ক্ষান্ত হোতেন না, বিভিন্ন কলা-কৌশলে আমাদের ঐ তিতা ঔষধ খাইয়েই ছাড়তেন। ঔষধ খাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়ে যেতাম এবং তখন সারা রাত আরামে ঘুমোতে পারতাম। পরে অনুশোচনায় চোখে পানি চোলে আসতো আর মনে মনে ভাবতাম যে, আমি দাদীমার সাথে কী খারাপ ব্যবহারই না কোরেছি। অথচ তিনি শত বকাবকি আর অত্যাচার সহ্য কোরেও শুধু আমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আমার ভালোর জন্য চেষ্টা কোরে গেছেন। এখন দাদীমা নেই, তবু আজও মনে মনে তার কাছে ক্ষমা চাই।

আজ আমরা যে সত্য তুলে ধোরেছি তা অনেকের কাছে হয়তো ঐ নিমরসের মতই তিতা। এটা রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথমে একটু বিস্বাদই লাগবে। গালাগালি দেবেন? দেন। আমরা কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণের জন্য সত্য প্রকাশ কোরছি, বিশ্বাস কোরুন এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোন স্বার্থ আমাদের নেই। শুধু আপনাদের ভালোর জন্য, যে অশান্তির অনলে আজীবন দগ্ধ হোচ্ছেন, সেই অশান্তি থেকে মুক্তির ওষুধ প্রাথমিকভাবে তিতা মনে হোলেও এর ফল সুমিষ্ট। দয়া কোরে আমাদের এই মহৌষধটি খান, কথা দিচ্ছি, আপনি এবং আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরামে ঘুমোতে পারবেন।

জনতার নামে চলছে সব...

আতাহার হোসাইন

আজকাল রাজনৈতিক সমাবেশগুলিতে দেখি প্রচুর জনসমাগম। জাতীয় পার্টির মিছিলে দেখলাম প্রচুর মানুষ। বিএনপির সমাবেশ দেখলাম লাখে লাখে মানুষ। আওয়ামী লীগের সমাবেশে তাই। জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ, তাতেও লোকের কমতি নেই। বামদের সমাবেশে যাবেন, কোন কমতি দেখবেন না। এই সব সমাবেশের নেতৃবৃন্দরা দাবী করেন তাদের গৃহিত সিদ্ধান্ত জনতা সমর্থন করে। শুধু তাই নয়, তারা বলে থাকেন এগুলো তাদের সিদ্ধান্ত নয়, এগুলো জনতারই সিদ্ধান্ত, জনতা এইগুলি চায়। ওদিকে যারা ক্ষমতাসীন দল, তারা দাবী করেন জনতা তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সমর্থন দিয়ে তাদের ক্ষমতায় পাঠিয়েছে, সুতরাং জনতার এই দাবী বাস্তবায়ন করা তাদের কর্তব্য। জনতার নামে চলেও তা। অপরদিকে জনতার দাবী বাস্তবায়ন করতে গেলে বিরোধীদলও হরতাল, ভাংচুর, মিছিল মিটিং করে। দাবী, এটাও জনতা চায়। আমরা দেখতেও পাই যে, কথা মিথ্যা নয়। তাদের এই কার্যক্রমে যারা অংশ নেয় তাদের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং যেহেতু জনগণ এটা চায়, সেহেতু এটাও চলছে জনতার নামে।

এইভাবে জনতা যে কতকিছু চাইছে তার কোন হিসাব নিকাশ রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে। জনতার নামে এই দাবী দাওয়ার কথা শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে পড়ছি। কত মতের কত পথের যে জনতা আছে তা বোঝাও ভারি কঠিন হয়ে পড়েছে। জনতার সিদ্ধান্ত এই অপরাধের বিচার করতে হবে, সেই অপরাধের বিচার করতে হবে। যেহেতু সরকার তাদের নির্বাচনের ইশতেহারে অমুক তমুক অপরাধের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো এবং তার উপর ভিত্তি করে জনতা তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছে, সুতরাং জনতার সাথে ওয়াদার খেলাপ করা যাবে না, সেহেতু জনতার

করবেন? কেন জনতার টাকায় এই সব কাজ করে বেহুদা টাকার অপচয় করা? জনগণ যা উচিত মনে করে তাই করে ফেলুক। খামোখা বিচারের দরকার কি? যেহেতু বিচার করলেও জনতা তা মানছে না।

অপরাধীকে ধরে প্রায় 'জনতা' গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলে, মাত্র কিছুদিন আগে এক প্রতিবন্ধী মেয়েকেও মারা হল ঠিক যেভাবে পাগলা কুকুর মারা হয়। সেই নির্মম দৃশ্য মোবাইলে ভিডিও করল জনতা, জাতীয় পত্রিকায় ছবি এলো সেই মেয়েটির। এমন হয় প্রায়ই, কিন্তু কোন মামলা হল না, বিচার হয় না। কার বিচার হবে? জনতা করেছে, সুতরাং তা জায়েজ। ফ্রান্সের জনগণ রায় দিয়েছে সমকামীতা জায়েজ। আইন পাস হয়ে গেছে, সমকামীতা সেখানে বৈধ। এই যে জনতার নামে সব কিছু চলছে, জায়েজ হয়ে যাচ্ছে- এর পরিণতি কি? এর পরিণতি হচ্ছে মানবজাতির মধ্যে বিরাজ করা অন্যায়, অশান্তি, হাহাকার আর নৈরাজ্য, যা দিন দিন চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলছে। কোন ধরণের স্থায়ী সিদ্ধান্তের মালিক নেই। জনতা যা চাইছে তাই হচ্ছে। এ এক চরম অরাজকতা।

মুক্তির পথ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কার মত বাদ দিয়ে আপনি কার মত রাখবেন, তা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কোন অবসান নেই। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় তা নির্ধারণ করার বা চূড়ান্ত রায় দেয়ার নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষ বলতে কেউ নাই। এই রকম কর্তৃপক্ষবিহীন অবস্থায় দেশ ও সমাজ আজ চূড়ান্ত হুমকির মুখে। জাতি আজ ধ্বংসের দোড়গোড়ায়। শেষ পর্যন্ত বলা যায় এটাও চলছে জনতার নামে।

গুরুজনদের কাছ থেকে শুনতাম যেটা ন্যায়, সেটা ন্যায়ই। সারা দুনিয়ার মানুষ এর বিরুদ্ধে গেলেও সেটা ন্যায়। আবার যেটা অন্যায় বা অনৈতিক, সারা দুনিয়ার মানুষ এর পক্ষে থাকলেও সেটা অন্যায় বা অনৈতিকই। কিন্তু এটাতো শ্বাশ্বত বাণী বা শাস্ত্রের কথা। রাজা বাদশাহরাও যদি কখনো শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করতেন প্রজারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করতো। প্রশ্ন হলো আজকের যুগে শাস্ত্রের কথা শুনে কে? এখন জনতাই সব, জনতাই জনতার এলাহ, জনতাই নিজের প্রভু। জনতা যদি বলে এখন থেকে সব হোটেল রেস্তোরায় গোবর পরিবেশন করতে হবে, তাহলে দেখছি তাই করতে হবে। কারণ, দেখতে পাচ্ছি যেখানে স্রষ্টা বিধান দিয়েছেন নারীপুরুষ তার জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য বিপরীত লিঙ্গকে বিয়ে করবে, সেখানে জনতা তা না করে সমলিঙ্গের মধ্যে বিয়ের দাবী তুলেছে। আর সরকারগুলো তার অনুমোদনও দিচ্ছে। জনতা যা চাইছে তা করছে। কারণ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তা না করেও উপায় নেই। ভালো কি মন্দ, কল্যাণ কি অকল্যাণ, রুচিশীল না অরুচিকর, সভ্যতা না অসভ্যতা তা নির্ধারণ করছে নিজেদের জন্য তারা নিজেরাই। তাদের উপর সর্বময় কর্তা কেউ নাই, কেউ একবার বলছে না যে জনতা তো এটা চায়, কিন্তু যিনি মানবজাতির স্রষ্টা, সবকিছুর স্রষ্টা তিনি কোনটা চান? আমি তাই এই অবস্থা দেখে আশঙ্কিত, আতঙ্কিত। বহু মতবাদে বিভক্ত জনতার এই সর্বময় প্রভু হয়ে যাওয়ার ভয়াবহ বিষময় ফল যখন বের হবে তখন বোঝা যাবে এর 'ঠ্যালা'। কারণ যে বীজ আপনি আজ রোপন করছেন, কয়েকদিন পর তার ফল আপনাকেই ভোগ করতে হবে। আর এই ফলই হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি।

দাবী মেনে নিয়ে শুরু হলো বিচার কাজ। জনতার দাবীকে বাস্তবায়ন করার জন্য আইন হলো, আদালত বসলো, বিচার হলো। এবার রায় পেয়ে জনতা খুশি নয়। এই জনতাই আবার লাখে লাখে জমায়েত হয়ে দাবী করলো এই রায় মানি না। আবার যাদের বিচার করা হলো তারাও লাখে লাখে সংখ্যার জনতা বলছে তারা বিচারের কিছুই মানে না। এখন আমার প্রশ্ন হলো আসলে জনগণ চায় কি? যারা যা-ই চায় তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। দীর্ঘদিন যাবত চলা সমাবেশে লোকের কোন কমতি নাই। আর মাশাআল্লাহ, আমাদের দেশের মিডিয়ার কল্যাণে তাদের পরিমাণ যে কম নয় তার প্রমাণও পাচ্ছি প্রতিনিয়ত। হাজার হাজার সাংবাদিক, মিডিয়া জগতের কর্মী, ক্যামেরা ক্রু, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের আনাগোনা যথার্থভাবেই প্রমাণ করে যে এই রায় সঙ্গত নয়। প্রযুক্তির কল্যাণে লাইভ দেখতে পাচ্ছি ঘরে বসে বসে। যেহেতু জনতা যা চায়, তা করতেও হবে। জনতার নামে সংসদে গিয়ে আইন পাল্টাও। জনতা হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস। যদি তাই হয় তবে আইনেরই বা দরকার কি, আর বিচারেরই বা দরকার কি আর বিচারকেরই বা কি দরকার? জনতা যা সঠিক মনে করে তাই করে ফেলা উচিৎ। ন্যায় কি, অন্যায় কি, কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন কি? বিধান তৈরির দরকারই বা কি? ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড যদি কেউ ঠিক করেও দেয়, জনতার নামে দেখা যাবে কয়েকদিন পর এসে অন্য জনতা বলবে আমরা তা মানি না। সুতরাং কে তাদের ঠিক করে দেবে ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিকের মানদণ্ড? ন্যায় অন্যায় নির্ধারণ করার ভিত্তি কি? তাদের জন্য কোন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ আছে কি? বহুমতের জনতা আছে। আগেই বলেছি আওয়ামী জনতা, বিএনপি জনতা, জাতীয় পার্টির জনতা, জামায়াতের জনতা কারোর সংখ্যাই কম নয়। সরকারি দল ক্ষমতায় যায় কত শতাংশের রায় নিয়ে? বাকীরাও কিন্তু তাদের তুলনায় সংখ্যার দিক দিয়ে অনেক বেশী এগিয়ে থাকে। তারাও কিন্তু জনতা। এইযে এতো রকম জনতা, এত মতের জনতা, এত রকম চাহিদা, এর ফাঁকে পড়ে আজ আমাদের সমাজ, সভ্যতা, আইন, বিচার, বিচারক সবাই প্রশ্নের সম্মুখীন। জাতি আজ এক ভয়ানক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ইতিহাসে এর আগে সম্ভবতঃ এতো বিশৃঙ্খলা আর কখনো দেখা যায় নি।

মত ও পথের কোন অভাব নেই। সমর্থকেরও অভাব নেই। বিচারক যদি জনগণের মতের ভিত্তিতে বিচার করেন তাহলে তার দরকার থাকে না। আইন রচনা করতে জনগণের প্রতিনিধিরা অহেতুক সংসদে হাজির হয়ে কেন সময় নষ্ট

DIVIDE & RULE-2

দাজ্জালের বিভক্তিকরণ নীতি:

শোষণের হাতিয়ার

মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান

পূর্ব প্রকাশের পর:

মতবাদ নিয়ে মতান্তর

দাজ্জাল অর্থাৎ পাশ্চাত্য ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্ম হীনতার উপর ভিত্তি কোরে বেশ কয়েকটি জীবনব্যবস্থা মানবজাতির উপরে প্রয়োগ কোরেছে। যখন দাজ্জাল জন্মলাভ করে তখন দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্র। ইউরোপের মধ্যযুগে রাজারা সিংহাসনে বসলেও তারা চার্চ তথা খ্রিস্ট ধর্মের পুরোহিতবর্গের কাছে একরকম জিম্মি ছিলেন, ফলে চার্চ ও রাজার দ্বৈতশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হোচ্ছিল জনগণ। যেহেতু খ্রিস্টধর্মের গ্রন্থ বাইবেলে কেবলমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করা হোয়েছে, সেখানে কোন শরিয়ত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি কোন কিছুই নেই তাই বাইবেল দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তবু গীর্জার প্রতাপ ছিল অপরিসীম। রাজতন্ত্র ও চার্চতন্ত্রের দ্বন্দ্ব যখন চরম আকার ধারণ করে তখন ১৫৩৭ সনে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী চার্চের প্রশাসনিক অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের অধিকারকে বিলুপ্ত কোরে নিজের শাসনদণ্ডকে নিরঙ্কুশ করেন। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেয়া অর্থাৎ পুরো মানবজাতিকে নাস্তিক বানানো সম্ভব নয়। তাই ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া হয় ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে, আজও তেমনই আছে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ মানেই হোল ধর্ম যার যার ব্যক্তিজীবনে থাকবে, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এর কোন হস্তক্ষেপ চোলবে না। এই ধারণা এসলামে অসম্ভব, কারণ এসলাম খ্রিস্ট ধর্মের মত কেবলমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে কাজ করে না, এসলাম মানুষের দেহ ও আত্মা উভয় অঙ্গনের বিধান সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (Complete code of life)। ব্যক্তিজীবনে এসলামের কিছু মানা আর জাতীয় জীবনে না মানা শেরক এবং কুফর। বর্তমানে মোসলেম নামের এই জনসংখ্যাটি ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে গ্রহণ ও জাতীয় জীবনে পরিত্যাগ কোরে শেরক ও কুফরে নিমজ্জিত হোয়ে আছে। যাহোক, ধর্মকে একেবারে মুছে ফেলতে না পেরে তাকে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে জন্ম হোল দাজ্জালের। ইংল্যান্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খ্রিস্টান জগৎ এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগে বাধ্য হোল। এর পর থেকে খ্রিস্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, এক কথায় জাতীয় জীবনে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার আর কোন কর্তৃত্ব রোইলো না। এর পর ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা ক্রমেই বস্তুবাদী (Meterialistic) হোয়ে পোড়তে শুরু কোরলো। এটা একটা পরিহাস (Irony) যে, যে জাতির সকল লোক এমন একটি ধর্ম গ্রহণ কোরলো যে ধর্মের মূলমন্ত্রই হোচ্ছে আত্মশুদ্ধি, কেউ এক গালে চড় দিলে তাকে অন্য গাল পেতে দাও, জোর কোরে গায়ের কোট খুলে নিলে তাকে আলখেল্লাটাও দিয়ে দাও, সেই জাতি একটি কঠোর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দেবে। এরপর ধীরে ধীরে মানবরচিত জীবনব্যবস্থাগুলি পরিণত রূপ লাভ কোরতে থাকে। এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রাথমিকভাবে রাজতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে প্রযুক্ত হোলেও এক সময় বাজতে আরম্ভ করে রাজতন্ত্রের বিদায়ঘণ্টা, জন্ম নেয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, যার মূলসূত্র পুঁজিবাদ। এই গণতন্ত্র ইউরোপে ধীরে ধীরে রূপ লাভ কোরল চরম ধণতান্ত্রিক গণতন্ত্রে। দেখা দিলো ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবিচার, ধনী- দরিদ্র ব্যবধান। এই অর্থনৈতিক অন্যায় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইহুদি পণ্ডিত কার্ল মার্কস আবিষ্কার কোরলেন পুঁজিবাদবিরোধী সাম্যবাদ (Communism)। প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদ ভিত্তিক সামন্তবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি কোরে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় ইহুদি পণ্ডিত কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। পাশাপাশি বিশ্বের কয়েকটি প্রভাবশালী দেশে একনায়কতন্ত্র প্রবল হোয়ে সাম্রাজ্যবাদী হোয়ে উঠলো। বাকি দুনিয়া তাদেরকে আখ্যায়িত কোরল ফ্যাসিস্ট হিসাবে। এক পর্যায়ে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র আঁতাত কোরে দুটি বিশ্বযুদ্ধ কোরে হিটলার ও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ পরাজিত কোরল, কিন্তু দুনিয়া থেকে একনায়কতন্ত্র একেবারে মুছে গেল না, পেছনের সারিতে গিয়ে অবস্থান নিল। তারপর পৃথিবী প্রধানত দুই মেরুতে বিভক্ত হোয়ে গেল- এক প্রান্তে সমাজতন্ত্র অন্য প্রান্তে গণতন্ত্র। কোথাও কোথাও গণতন্ত্রের ধড়ের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের লেজ জুড়ে সাধারণ মানুষকে গিনিপিগ কোরে অদ্ভুত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হোল। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই মানুষকে কাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে সক্ষম হোল না। পুঁজিবাদে দেশের জনগণের অধিকাংশ সম্পদ গুটিকয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হয়, বঞ্চিত হয় অধিকাংশ মানুষ, সমাজতন্ত্রেও তাই। দেশের সব সম্পদ জড়ো হয় সরকারের তহবিলে, বঞ্চিত হয় সেই অধিকাংশ মানুষ। সুতরাং অবধারিতভাবে আবারও ঘটে সহিংস বিপ্লব, অভ্যুত্থান- যা কখনও সামরিক, কখনও বেসামরিক। বিংশ শতক জুড়ে চলে সমাজতন্ত্রের আধিপত্য যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাতরে জীবন দিয়েছে। অবশেষে নব্বইয়ের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তি ও জার্মানের বার্লিন প্রাচীর ধ্বংসের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র দ্বিতীয় কাতারে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রথম সারিতে আসে গণতন্ত্র। বিশ্বের মোড়লিপনা থেকে ছিটকে পড়লেও সমাজতন্ত্র মতবাদ হিসাবে বেশ শক্তিশালী এখনও। সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে প্রবেশ করা যে কড়াই থেকে চুলাতে লাফ দেওয়া তা এখন সকলের সামনেই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হোয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে অন্যায়, অশান্তি, অবিচারের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত হোয়ে আছে। এ সবগুলি জীবনব্যবস্থা মানবজাতির মধ্যে এমন একটি হ-য-ব-র-ল পরিবেশ সৃষ্টি কোরে রেখেছে যে ভৌগোলিক রাষ্ট্রগুলি তো বটেই, এমনকি প্রত্যেকটি দেশের মানুষ পৃথক পৃথক মতবাদে বিশ্বাসী, একই মতবাদের মধ্যেও আবার রোয়েছে দ্বিধাবিভক্তি। যেমন সমাজতন্ত্রের মধ্যে রোয়েছে মাওবাদ, লেলিনবাদ ইত্যাদি। গণতন্ত্রীদেরও ভাগ আছে যেমন- উদারপন্থী (Liberal), রক্ষণশীল (Conservative), প্রজাতান্ত্রিক (Republican) ইত্যাদি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো গণতন্ত্র সরিসৃপের মত তার রূপ পরিবর্তন কোরে রাজতন্ত্রের সঙ্গেও থাকে, সামরিকতন্ত্রের সঙ্গেও থাকে, সমাজতন্ত্রের সঙ্গেও থাকে। আজ বিশ্বের কোন দেশ গনতন্ত্র, কেউ রাজতন্ত্র, কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ সাম্যবাদ ইত্যাদি গ্রহণ কোরে বিভক্ত হোয়ে আছে। এভাবেই মানবজাতি দাজ্জালের মতবাদগুলিকে আশ্রয় কোরে বহু ভাবে বিভক্ত।

মুদ্রার মানের তারতম্য

পৃথিবীকে টুকরো টুকরো কোরে ভাগ করার চূড়ান্ত পরিণতি কি? এর অনিবার্য্য পরিণতি হোল: এক পিতা মাতা আদম ও হাওয়া (আ:) থেকে আগত সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টি হবে- আমি আমরা, তুমি তোমরা। তৈরি হবে সীমানা, প্রাচীর। তারা পরস্পর হবে পরস্পরের জাতশত্রু। প্রত্যেকটা সীমানার মধ্যে এবার নিজস্ব সরকারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ভাগ, নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা চালু হলো। এবার পানি, বাতাস, আলো ইত্যাদির মতো মানুষদেরও চলার পথ প্রয়োজন হবে। সীমানা তৈরি হোলে পরে তা ভাঙ্গার প্রবণতাও দেখা দেয়। তার প্রমাণ দুই জার্মানি, দুই কোরিয়া, দুই সুদান। মানুষের প্রয়োজনই এই প্রবণতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ সবকিছু একজায়গায় রাখেন নি, তাই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় কিছু মানুষকে বন্দী কোরলে তারা তো আর সব কিছু সেখানে পাবে না, তাকে অন্য জায়গায় পাড়ি দিতে হবে। এই বিভাজনের ফলে সম্পদের বন্টন হোচ্ছে ভারসাম্যহীন, এক স্থানে বিরাট সম্পদের অধিকারী, অন্যস্থানে দারিদ্র্য সৃষ্টি হোয়েছে। অনিবার্য্যভাবেই আসছে মুদ্রার ফারাক- ডলার, রিয়াল, ইউরো, রুবল, টাকা, রুপি ইত্যাদি। মানুষের মতো মুদ্রাও ইচ্ছা কোরলে সীমানায় আটকা পড়লো। সীমানা ডিঙ্গাতে গেলে তার মান-হানী হয়। এর ফলে উন্মুক্ত হোল অবৈধ হুন্ডি ব্যবসা, মানি লন্ডারিং, মুদ্রা পাচার, চোরাকারবারী, ভিসা পাসপোর্ট জালিয়াতি, নোট জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধের দুয়ার।

ধর্মীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কত যে ভাগ আছে তা বোলতে গেলে লেখা অনেক দীর্ঘ হোয়ে যাবে। এক এলাকায় যে দেবতার পূজা করা হয়, অন্য এলাকায় সেই দেবতার নামও অজানা। হৃদয় বিদারক বর্ণভেদ প্রথা আজও হিন্দু সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। খ্রিস্টানরা তো শুরুতেই দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ হোয়ে গেল: ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। মুসলমানরা হলো শিয়া, সুন্নি, হানাফি, সালাফি, ওহাবী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দাজ্জাল এই বিভক্তি গুলিকে জাতিগুলির আত্মায় একেবারে পাকাপোক্ত কোরে দিল। মাদ্রাসাগুলিতে এই শিয়া ও সুন্নী মতবাদ, বিভিন্ন এমামের মতবাদগুলিকে আলাদাভাবে শেখানো হোল ফলে এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা চিরকালের তরে একে অপরের শত্রু বনে গেল। একটি বিষয়ের নামই রাখা হোল তর্কশাস্ত্র। অর্থাৎ যত পার মত তৈরি কর, যত পার পথ তৈরি কর। পথ-মত তৈরি কোরতে কোরতে এখন এক এসলামেই হলো হাজার হাজার ভাগ, মত, ফেরকায় বিভক্ত। সারা বিশ্বে মারেফতি তরিকাগত বিভক্তি যে কত আছে তার হিসাব নেই; চিশতীয়া, কাদেরিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, নকশাবন্দিয়া। পীরের অনুসারীদের মধ্যে এক পীর আরেক পীরের অনুসারীদের শুধু বিরোধিতা, বা ঘৃণাই করে না হামলা কোরে

ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী (১৪৯১-১৫৪৭)

হতাহত পর্যন্ত কোরছে। ভৌগোলিক সীমা থেকে ধর্মীয় সীমারেখা আরো মারাত্মক। ভৌগোলিক সীমারেখা যাও গুলি খেয়ে, ড্রামের ভিতরে ঢুকে, লাশের গাড়িতে কোরে হলেও পার হওয়া যায়, কিন্তু এই ধর্মীয় সীমানা কোন অবস্থাতেই পার হওয়া যায় না। একজন খ্রিস্টানকে বৌদ্ধ বানানো বা হিন্দুকে মুসলমান বানানো যতটা না কঠিন, একজন শিয়াকে সুন্নী বানানো বা সুন্নীকে শিয়া বানানো তার চাইতে কঠিন। বিষয়টা এখানে শেষ হোলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু প্রতি বছর শুধুমাত্র শিয়া, সুন্নি সংঘর্ষে কত হাজার লোক যে নিহত হয় তার হিসাব কয়জনে রাখে? কি নিদারুণ পরিহাস।

দাজ্জালের তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদের বিষাক্ত নেশায় এ জাতি এতটাই আচ্ছন্ন যে রাজনৈতিক হানাহানিতে এভাবে পশুর মত পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলার দৃশ্য আমাদের প্রায়ই দেখতে হয়। সরকার বদলায় কিন্তু অবস্থা বদলায় না।

রাজনৈতিক বিভক্তি

এবার একই দেশের জনগণের মধ্যে তোলা হলো রাজনৈতিক মতবাদের প্রাচীর। প্রতিটি রাষ্ট্রে আদর্শগত তারতম্যের প্রেক্ষিতে তৈরি করা হোল গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিভেদ। কী অকল্পনীয় অর্থ ব্যয় কোরে, দাঙ্গা হাঙ্গামা কোরে, অস্থিরতার মাধ্যমে একটি দল ক্ষমতায় আরোহণ করে। ইদানীং আবার একক দল ক্ষমতায় যাওয়ার মতো জন সমর্থন না পেয়ে সমমনাদের নিয়ে জোট গঠন কোরে ক্ষমতায় যায়। যদিও সমমনা বলা হয় কিন্তু বাস্তবে সমমনাতো নয়ই, বরং এক দল আরেক দলের এমন শত্রু যে সুবিধা আদায়ের একটু হের ফের হোলেই হেঁচকা টানে সরকারের পতন ঘটায়, এ জন্য প্রায়ই সরকারগুলি স্থিতিশীল হয় না, মেয়াদ পূর্ণ কোরতে পারে না। একটি সরকার কোন একটি প্রকল্প বা প্রক্রিয়া শুরু কোরতে না কোরতেই তার মেয়াদ শেষ হোয়ে যায়, অপর সরকার এসে বহুক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া স্থগিত কোরে দেয়। [কিন্তু এসলামে সরকারের নির্দিষ্ট কোন সময়কাল বা মেয়াদ (Tenure) নেই। একজন শাসক যতদিন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জনগণকে শাসন কোরবে ততদিন সে শাসকের পদে থাকবে।]

কিন্তু কেউই শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় না, কারণ পেছনে লেগে থাকে বিরোধী দল। তারা সরকারের ঘুম হারাম কোরে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল নামক শত্রুদল না থাকলে চোলবে না, সেটা নাকি স্বৈরতন্ত্র হোয়ে যায়। এখন বিরোধীদল কয়টা থাকবে, একটা না দশটা এর কোন নির্দিষ্টতা নেই। কোন কোন দেশে দেখা যায় কয়েকশ' দল আছে সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের সমর্থকের চেয়ে বিরোধীই বেশি, দেশের অধিকাংশ মানুষ সরকারের বিরোধী হোলেও সেই সরকার 'গণতান্ত্রিক'। আবার বিরোধিদলীয় জোট তৈরিরও ব্যবস্থা রাখলো। বিরোধী দলের কাজই হোচ্ছে সরকারের ভালো মন্দ সব কাজের বিরোধিতা করা। এটা এমন এক একটা শয়তানি চক্রান্ত যা দিয়ে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিবাদ, কলহ, মারামারি ইত্যাদি স্থায়ী ও স্বাভাবিক হোয়ে গেছে।

কারাগারেও বিভক্তি

সামান্য চুরির অপরাধে একজন সাধারণ মানুষ এমন গাদাগাদি কোরে কি অমানবিকভাবে থাকে যা বাইরের কেউ ভাবতেও পারবে না। দশজনের রুমে একশত জন, আর মন্ত্রীরা পুকুর চুরি কোরে পায় 'ডিভিশন-Division'। 'আইনের চোখে সবাই সমান' এ আপ্তবাক্য সংবিধানের পাতাতেই রোয়ে যায়। দাজ্জালের মাধ্যমে এবলিস এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ কোরে অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, মানুষ যেন কোন ক্ষেত্রেই ঐক্যে আসতে না পারে।

চাকুরীক্ষেত্রে বিভক্তি

চাকুরীতেও রাখা হোল বিভিন্ন গ্রেড, বিভিন্ন বেতন কাঠামো। বেতন কাঠামোয় প্রথম গ্রেডের মাসিক বেতন দেড়, দুই লক্ষ থেকে শুরু কোরে নিম্নতম গ্রেড দুই, তিন হাজারের করা হলো। কেউ বাড়ি, গাড়ি শান-শওকত, কাজের লোক, সরকারী সুযোগ সুবিধা পেলো আর কারো একেবারে না খেয়ে মরার অবস্থা, ফলে খুঁজতে হয় দুর্নীতি করার অজুহাত, আইনের ফাঁক ফোকর। সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা করা হোল আনুষ্ঠানিক বিভেদ। সরকারি কর্মচারীরা কোরল ইউনিয়ন আর অফিসাররা কোরল ক্লাব। এদের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্য তৈরি কোরে সৃষ্টি করা হোল অনিবার্য্য বিরোধ। পারস্পরিক সম্পর্ক এমন হোয়ে দাঁড়ালো যে কর্মচারী পারলে অফিসারকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারে। শুধু তাই নয় দাবি আদায়ের নামে শ্রমিক কর্মচারীরা এমন আচরণ করে যে, অফিসার নামের ভদ্রলোক বেচারার ইজ্জত, সম্মান আর কিছুই থাকে না। এই বিভক্তি, ভাগ Division যেখানে, সেখানে কিভাবে উন্নতি হয়, প্রগতি হয়। সরকারী-বেসরকারী সকল চাকুরিক্ষেত্রে চলে ভয়াবহ দুর্নীতি, এমন দুর্নীতি করে যে, কর্মকর্তারা নিজের আখের গোছাতে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেন, যাকে প্রচলিত ভাষায় দেশ বিক্রি আখ্যা দেওয়া হয়। এদের আবার ধরার জন্য তৈরি দুর্নীতি দমন কমিশন। মজার ব্যাপার হলো দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও হয় দুর্নীতি মামলা।

ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?

হুমায়ূন কবীর

প্রতি বছরের মতো এবারও পালিত হয় জন্মাষ্টমী বা শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী। এটি বৈদিক ধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। পঞ্জিকা মতে, সৌর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয়, তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়। উৎসবটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রতি বছর মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে পড়ে। তবে এটাই যে তাঁর সঠিক জন্মদিন তা একেবারে নিশ্চিত কোরে বলার উপায় নেই। যাহোক, শ্রীমদভাগবতগীতার উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণের সঠিক পরিচয়কে উদ্ঘাটন কোরতে গিয়ে বহু মনীষী, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি সুগভীর গবেষণা কোরেছেন। তাদের অনেকেই অভিমত দিয়েছেন যে, আল্লাহ সকল জাতিগোষ্ঠীতে ও জনপদে ঐ এলাকার ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ সহকারে তার নবী-রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ঐ নবীদের বিদায়ের পরে তার শিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থ বিকৃত কোরে ফেলা হোয়েছে। ফলে ঐ এলাকার মানুষকে নতুন কোরে পথ দেখাতে আবির্ভূত হোয়েছেন অন্য নবী, যারা পূর্বের বিকৃত গ্রন্থকে রদ ঘোষণা কোরেছেন এবং নতুন বিধান জাতিকে প্রদান কোরেছেন। কেউ তাকে মেনে নিয়েছে, কেউ মেনে নেয় নি। এভাবে জন্ম হোয়েছে একাধিক ধর্মের। কালক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক এলাকার ধর্মের অনুসারীরা অন্য এলাকায়, অন্য ভাষায় নাযেলকৃত ধর্মকে ধর্ম হিসাবে এবং ঐ ধর্মের প্রবর্তককে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। যেমন ইহুদিরা ঈসা (আ:) কে আল্লাহর প্রেরিত বোলে স্বীকার করে না, খ্রিস্টানরা আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:)-কে নবী হিসাবে স্বীকার করেনা একইভাবে মোসলেমরা ভারতীয় অঞ্চলে ভারতীয় ভাষার মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বৌদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ এঁদেরকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন না। কিন্তু তাদের প্রচারিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আখেরী নবীর আগমনের বহু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত আছে যা গবেষণা কোরলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ ধর্মগুলিও আল্লাহরই প্রেরীত (যা এখন বিকৃত হোয়ে গেছে), এবং স্বভাবতই সেগুলির প্রবক্তারা আল্লাহরই বার্তাবাহক অর্থাৎ নবী ও রসুল। এমনই একজন গবেষক ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ধর্মীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইসলাম প্রচার মিশনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কে.এম.এ হোসাইন তার গবেষণা গ্রন্থ 'ইসলাম কি ও কেন'- তে গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের নবী হওয়ার পক্ষে বিস্তারিত যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখ কোরেছেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি এমনই একটি গবেষণাকর্ম যাতে জনাব কে.এম. হোসাইনের বইসহ আরও বেশ কিছু বইয়ের সহায়তা নেওয়া হোয়েছে।

ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দু ধর্মের অবতার বলা হোলেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বোলে কোন ধর্ম বা হিন্দু শাস্ত্র বোলে কোন শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতায়, পুরাণে কোথাও হিন্দু শব্দই নেই। শব্দটি এশিয়া মাইনর, খুব সম্ভব তুর্কী দেশ থেকে এসেছে সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। উপমহাদেশে প্রচলিত এই ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম, কোর'আনে যেটাকে বলা হোয়েছে দীনুল কাইয়্যেমা, শাশ্বত, চিরন্তন ধর্ম, অর্থাৎ তওহীদ (কোরান- সূরা রুম, আয়াত ৪৩, সূরা বাইয়্যেনা, আয়াত ৫)। অবতার শব্দের অর্থ পৃথিবীতে আগমন। ঈশ্বরের অবতার বোলতে বুঝায় যে, নিখিল বিশ্বে ঐশী প্রত্যাদেশ প্রচারকারী মহামানবের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা। সেই সময় হতেই মানবজাতি যাতে পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস কোরতে পারে, মানবে মানবে হানাহানি, রক্তারক্তি, অন্যায়-অবিচার, যুলুম-অত্যাচার না করে তাই সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াতে ধারাবাহিকভাবে নবী রাসুল (অবতার, মহামানব) প্রেরণ করেছেন।

আল কোর'আন বলছে,

➪ প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে রসুল (সূরা ইউনুস ৪৮)।

➪ প্রত্যেক জাতির জন্য হাদী বা পথ প্রদর্শক রয়েছে (সূরা রাদ ৮)।

➪ আমরা প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে কোন না কোন রাসুল পাঠিয়েছি" (সূরা নাহল-৩৭)।

➪ এমন কোন জাতি নেই, যার কাছে সতর্ককারী (নাযের) আগমন করে নাই (সূরা ফাতির -২৫)।

কোর'আনের এইসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে আল্লাহ বিভিন্ন যুগে নবী-রাসুল, পথ-প্রদর্শক, সতর্ককারী ও সুসংবাদাতা পাঠিয়েছেন। মোসলেম হওয়ার শর্ত হিসাবে ঐ সব নবী-রসুলগণের উপর বিশ্বাস স্থপন করা অবশ্য জরুরী। তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন। মো'মেনদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে,

➪ মো'মেনরা বলে, আমরা রসুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য কোরি না (সূরা বাকারা- ২৮৫) অর্থাৎ কোনো নবীকে মানবো, কোনো নবীকে অস্বীকার করবো তা হবে না, তারা সকলেই আল্লাহর রসুল। এ বিষয়েই আল কোর'আন বলছে,

➪ যারা চায় আল্লাহ এবং কতককে অস্বীকার, আর তারা চায় যেন এই দুয়ের মধ্যে একটি মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করতে। এই সমস্ত লোকেরাই হচ্ছে পাক্কা কাফের। মো'মেন হ'ল তারা যারা আল্লাহ এবং রসুলগণের উপর

ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে - কোন পার্থক্য করে না (সূরা নেসা ১৫০-১৫২)।"

এইসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুগে যুগে আগত সকল নবী-রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মো'মেন মোসলেমের জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরদ)। যদি একজন নবীকেও অস্বীকার করা হয়, তবে সে ব্যক্তি "সত্যিকার কাফের" হয়ে যায় এবং পরিণাম হচ্ছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (সূরা বাকারা-১৫২)।

পাঠকগণ, পবিত্র কোর'আনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস পাঠে আমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা মতান্তরে দু-লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলগণের পৃথিবীতে আগমনের কথা জানতে পারি। কোর'আন বলছে-

➪ আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসুল পাঠিয়েছি, যাদের মধ্যে কারো বিষয় তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কারো কারো বিষয় বর্ণনা করি নাই (সূরা মো'মেন-৭৯)।

যদি সব নবীদের নাম-ধাম বৃত্তান্ত আল-কোর'আনে বর্ণনা করা হতো তাহোলে একটি বিশ্বকোষের আকার ধারণ করতো। বইবেলে বর্ণিত সকল নবীর নামও কোর'আনে উল্লেখ করা হয় নাই, আর তার প্রয়োজনও নেই। প্রত্যেক নবী-রসুলগণ তাঁদের জাতির ভাষায় তথা মাতৃভাষায় ঐশীবাণী প্রচার করেছেন, যাতে তাদের জাতির লোকেরা সহজেই নবীর শিক্ষাকে বুঝতে ও অনুসরণ করতে পারে। আর এ বিষয়েই আল-কোরআন বলছে, -

➪ আমরা প্রত্যেক রসুলকেই তাঁর জাতির ভাষায় পাঠিয়েছি, এই জন্য যে, যেন তাদের নিকট স্পষ্ট কোরে (আমার বাণী) প্রচার করতে পারে (সূরা ইব্রাহীম-৫)।

এই আয়াতের মর্মবাণী হচ্ছে, অতীতের প্রত্যেক নবী-রসুলগণ যে যে অঞ্চল ও জাতিতে আগমণ করেছেন, সেই জাতি ও সেই জাতির ভাষাতেই তারা ওহী, এলহাম, দিব্যজ্ঞান, বোধি লাভ কোরে সেই অঞ্চলে একই ভাষা-ভাষীর মধ্যে প্রচারকার্য্য চালিয়েছেন। ঐসব ভাষা হিব্রু, পার্শী, সংস্কৃত,পালি, চীনা বা অন্য যে কোন ভাষাই হোক না কেন। সুতরাং অতীত জাতির নবীদের জানতে হলে আমাদের অবশ্য বিভিন্ন ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থগুলি যথা 'বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-গীতা-সংহীতা, উপনিষদ, মহাভারত, ত্রিপিটক, দিঘা-নিকায়া, জেন্দাবেস্তা, তওরাত-যবুর-ইঞ্জিল' ইত্যাদি গবেষণা ও পাঠ কোরে কোর'আনের আলোকে অতীত নবীদের সম্বন্ধে সত্যিকার পরিচয় জানতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে নিশ্চিত কোরে বলা যায় যে, পাক-ভারত উপমহাদেশেও আল্লাহ নবী-রসুল-অবতার প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রচারিত বাণী-ঐশীগ্রন্থ বিকৃত অবস্থায় হলেও ঐ জাতির মধ্যে এখনও বংশ-পরম্পরায় অনুসৃত হয়ে আসছে, তাদের ভক্ত-অনুরক্ত অনুসারীদের মাধ্যমে। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো যে, শ্রীকৃষ্ণ ও মহামতি গৌতম বুদ্ধ আমাদের প্রস্তাবিত উপমহাদেশের আল্লাহ প্রেরিত নবী-রসুল-অবতার ছিলেন কিনা।

এসলামী চিন্তাবিদ ও মোসলেম মনীষীদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

ভারতীয় মোসলেম চিন্তাবিদ ও এসলামিক দার্শনিকগণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেসব সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন এবং কোর'আন হাদিসের আলোকে তাঁর সম্বন্ধে যে বক্তব্য দিয়েছেন ঐসব মতামত ও বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন নবী।

➪ মোজাদ্দেদে আলফেসানী সরহিন্দ (রাঃ) কাশ্‌ফে প্রায় ৩০-৫০ জন ভারতীয় নবীর সমাধি দর্শন করেছেন বলে হাদীকা মাহমাদিয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

➪ ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত এসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব আবুল হাশিম তাঁহার বিখ্যাত "Creed of Islam" গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধকে আল্লাহর নবী বলে তথ্যপ্রমাণ দিয়েছেন এবং নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দরুদ ও সম্মানসূচক "Peace be upon him" বা আলাইহে সালাম (আঃ) ব্যবহার কোরেছেন।

➪ খ্যাতনামা তাপস মির্জা মাজহার জানজানান এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা কোরতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে নবীরূপে স্বীকার কোরে 'মাকামাতে মাজহারি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

➪ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতবী শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে নবীরূপে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছেন (মাবাহাসা শাহজাহানপুর সৎ-ধর্ম প্রচার)।

➪ মাওলানা জাফর আলী খান লিখেছেন, এমন কোন জাতি বা দেশ নেই; যার দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ তা'লা কোন নবী রসুল প্রেরণ করেন নাই। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে , শ্রীকৃষ্ণ মহান প্রভুর রেসালতের ধারায় ভারতীয় নবীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন (প্রতাপ, ২৮ শে আগষ্ট ১৯২৯)।

➪ উপমহাদেশের প্রখ্যাত এসলামী চিন্তাবিদ ও মহানবী মহাম্মদ (সঃ) এর জীবনীকার "সীরাতুন্নবীর" (সঃ) রচয়িতা "আল্লামা শিবলী নোমানী, ভারতীয় নবীদের সমন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য ভারতীয় নবীদের জীবনী ও সত্যিকার পরিচয় আজ নানারূপ কল্পকাহিনীর আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।

➪ আল-কোরআনের তাফসির গ্রন্থ "তাফসীরে ওয়াহিদী" তে মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান অকাতরে স্বীকার করেছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ আল্লাহর এক প্রিয় ও সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। এবং নিজ যুগ ও জাতির জন্য খোদার পক্ষ হতে সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

➪ খাজা হাসান নিজামী বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দুস্কৃতিকারীদের বিনাশকল্পে প্রেরিত অবতার ছিলেন (কৃষণবিতি)।

➪ উপমহাদেশের আরও একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, এসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সোলেমান নদভী হিন্দুদের পূজ্য অবতার শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধকে নবীরূপে স্বীকার করে তাঁর "সিরাত মোবারক" ১৯৮২ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

➪ আল-কোর'আনের ব্যাখ্যাতা প্রখ্যাত তাফসিরকারক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফতি এবং প্রখ্যাত তাফসির গ্রন্থ "মা'আরেফুল কোর'আন" এর রচয়িতা (আটখণ্ড) মুফতি মোহাম্মদ শফি, তাঁর গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, আর্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সকল ঋষিগণই নবী-অবতার ছিলেন।

➪ মাসিক পত্রিকা "পৃথিবীতে" মন্তব্য করা হয়েছে যে, "গীতার শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একেশ্বরবাদী। এই পরমপুরুষের উল্লেখ করে মহানবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন- "কানা ফিল হিন্দে নবীয়ান আসওয়াদুল লাওনা ইসমুহু কাহেন।" (হাদীসে দোলমী, তারিখে হামদান, বাবুল কাফ।) অর্থাৎ- "ভারতবর্ষে এক নবীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং কানাই নামে পরিচিত।" আমরা সবাই

জানি যে, শ্রীকৃষ্ণের আসল নাম কানাই। আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিফতি নাম। মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী' আরো উল্লেখ করেছে যে, ভারতের বৈদিকযুগ ছিল এসলামের যুগ।-(মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮)।

➩ ড. রফিক জাকারিয়া এক প্রবন্ধে বিভিন্ন মোসলেম মনীষী ও ওলামাদের উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে,- According to the Quaranic declarations, not only Moses and jesus, but all the Vedic Rishies of old and Rama, Krishna... ...have alike place in the hearts of the true followers of Islam" (Ilustrated weekly of India. Dated 28.10.1973)।

➩ এসলামের চতুর্থ খলিফা, জ্ঞানের দরজা নামে খ্যাত, নবী করিম (সা:) এর প্রিয়তম ভ্রাতা ও জামাতা এসলামের ইতিহাসে খ্যাতনামা সমরবিদ আলী (রা:) বলেছেন, "আল্লাহ তা'লা কৃষ্ণবর্ণের এক নবী পাঠিয়েছিলেন, যার নাম কোর'আনে উল্লেখ করা হয় নাই।" (কাশশাফ, মাদারেক) এই বর্ণনা থেকে একজন কৃষ্ণ বর্ণের নবীর আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া গেল, যা নবী করিম (সা:) কর্তৃক ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হাদিসের "আসওয়াদুল ও এসমুহু কাহেন" কৃষ্ণবর্ণ ও কানাই নামে ভারতীয় নবী-অবতার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

➩ ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরো বহু হিন্দু মোসলেম পণ্ডিত ও ভাষাবিদ সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ গবেষণা কোরে এমন অনেক সত্য-সনাতন বাণী খুঁজে পেয়েছেন, যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বৈদিক শ্লোকগুলো ঐশীবাণী এবং বৈদিক ঋষিরা নবী-অবতার, অন্তিম-ঋষি-নরাশংস, কল্কি-অবতার মহানবী মুহাম্মদ (সা:)। ঐ সব গ্রন্থের বাণী সত্য ও প্রবক্তারা সত্যবাদী না হলে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপে সত্য হতে পারে?

➩ কবি নজরুল তাঁর মানুষ কবিতাতে লিখেছেন, মূর্খরা সব শোনো/মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো। আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মাদ/কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, বিশ্বের সম্পদ। এখানে পবিত্র কোর'আনে যাঁদেরকে নবী বোলে সত্যায়ন করা হোয়েছে তাদের সঙ্গে একই কাতারে কৃষ্ণ ও বুদ্ধের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, কবি নজরুল তাঁদেরকেও নবী হিসাবে বিশ্বাস কোরতেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনাচার ও বৈশিষ্ট্য কী বলে?

প্রাচীন যুগ হতে প্রত্যেক ধর্মে কুরবানী বা উৎসর্গের রীতি চালু আছে। কুরবানীর সময় এলে শ্রীকৃষ্ণ পশু কুরবানী করেছেন। এর মধ্যে একটি গাভীও ছিলো (ভগবত, দশম স্কন্দ, অধ্যায়-৫৮)। এছাড়াও শ্রী-কৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা জানি, তিনি ছোটবেলায় মেষপালক ছিলেন, যা এসলামের অনেক নবীর জীবনীতেও আমরা পাই। এছাড়াও তাঁর জন্মের পূর্বে উনার জন্মকে ঘিরে ভবিষদ্বাণীও করা হয়েছিলো বলে জানতে পারি, যে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে কংস রাজা বহু শিশু হত্যা করে। শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন করার জন্য। মহাভারতে আছে

➩ "ধর্মব্যুচ্ছিতি মিচ্ছিন্তো যেই ধর্মস্য প্রবর্তকঃ অর্থাৎ- যারা ধর্মের উচ্ছেদ কামনা করে অধর্মের প্রবর্তন করে, সেই দুরাত্মাদেরকে বিনাশ করা একান্ত কর্তব্য (১২/৩৩/৩০)।

➩ ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল আপোষহীন। তিনি কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন কোরতে আসেননি (ভগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ১ম খণ্ড ১৭২ পৃ.)। তিনি চির-সত্য, সনাতন ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভারত বলছে, "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণ সত্যমত্রা প্রতিষ্ঠিতম (মহাভারত ৫/৮৩/১২)।

➩ তিনি কখনো ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নি। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। ঘর-সংসার সমাজ পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি বসবাস করেছেন। তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সবই ছিল। তিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানুষই ছিলেন। যেমন মহাভারতে বলা হচ্ছে- "মানুষং লোকমতিষ্ঠ বাসুদেব-ইতিশ্রুত (মহাভারত ৬/৬৬/৮-৯)।

➩ তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তন্মধ্যে মামাতো ও ফুফাতো বোনদের মধ্যে ভদ্রা, মিত্রবিন্দাকে বিয়ে করেছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীদের নাম-রুক্সিনী, কালিন্দী, সত্যা, জাম্ববতী, রোহিনী, লক্ষণা, সত্যভামা, তন্বী। এক কথায় তিনি ছিলেন, "মানুষীং যোনি মস্তায় চরিষ্যতি মহিতলে (মহাভারত ৬/৬৬/১০২)। অর্থাৎ এই ধরার বুকে একজন মানুষের মত মানুষ'। তাঁর যুগের আদর্শ মানব, মহামানব।

➩ তিনি ছিলেন সত্য ধর্মের প্রচারক তথা বৈদিক ঋষিদের প্রচারিত ধর্মের বাহক ও প্রচারক যাহা ছিল সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ধর্ম এসলাম। সত্য ও সত্যধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেমন মহাভারত বলছে "নাস্তি সত্যাত পরোধর্ম" সত্যই ধর্ম আর ধর্মই সত্য। আর এই সত্য ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে তিনি যুদ্ধের অনুমতি দিতেন (ভগবৎ পুরাণ ৫/১৫১/৪৫)।

➩ অন্যান্য নবী-রসুলদের ন্যায় তিনিও অযথা রক্তপাত, অন্যায় যুদ্ধ পছন্দ করতেন না। ভগবৎ পুরাণ দেখুন তাই বলছে ঃ "সর্বোথা যতমানা নামযুদ্ধ ভিকাংক্ষতাম সান্তে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধং নাপরাক্রমঃ" (ঐ ৫/৭২/৮৯)। তিনি বলেছেন, এই ধর্মযুদ্ধে নিহত হলে, "হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং স্বর্গলাভ।" অথাৎ- শহীদ ব্যক্তি স্বর্গলাভ করেন (ঐ)।

➩ অন্যান্য নবীদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আপনজন আত্মীয়রাই তাঁর প্রধান শত্রু, বিরোধী ছিলেন। (ভগবৎ ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস পৃ-৩০০) তারা তাঁর উপর নির্যাতন করেন। উল্লেখ্য যে, মথুরার রাজা কংস বা কনিষ্কো যিনি শ্রীকৃষ্ণের আপন আত্মীয়, মামা ছিলেন। তাঁর অত্যাচারের কারণেই বাধ্য হয়ে তিনি দ্বারকায় 'হেজরত' করেন, যা অনেক নবীর ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল।

➩ অনেক ধর্মদ্রোহী শ্রীকৃষ্ণকে বেদ-বিরোধী মনে করে তাঁর বিরোধিতা করেছেন (ঐ ২০০ পৃষ্ঠা)। সত্যিকার অর্থে তিনি ঐশী-গ্রন্থ বেদের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু পূর্ববর্তী বিকৃত বৈদিক ধর্মের পুরোহিতরা বেদ ও বেদের নামে বিকৃত প্রক্ষিপ্ত মনগড়া বাণী প্রচার করতো আর তাই তিনি এই বিকৃতধর্ম বাণীর বিরোধিতা করতেন।

➩ তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে প্রকৃত মীমাংসা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন (মহাভারত ১৩/৫৮/৫-৬), যা অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও সত্য। ঐ যুগের অসুর প্রকৃতি (কাফের) মানুষরা সত্য-ধর্মের বিরোধিতা করতো এবং অসত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কোরতে তৎপর ছিল। যেমন বলা হয়েছে, "অসত্রম

প্রতিষ্ঠিংতে জগদাহুরানশ্বরম।" অর্থাৎ-সত্যধর্ম ব্যবস্থায় বিশ্বাস বা জগদীশ্বরে বিশ্বাস করতো না (গীতা-১৬/৮)।

➪ ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। ধর্ম ছাড়া মানুষ পশুর সমতুল্য। যেমন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনংচ সামান্য মেতৎ পশু ভিনরানাম। ধর্মেহিতেসো মধিক বিশেষঃ ধর্মে নহীনা পশুভির্সমানাঃ।" অর্থাৎ- ধর্মহীন মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, উভয়েই আহার নিদ্রা, ভয় এবং যৌন কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে।"

➪ অবতার শ্রীকৃষ্ণ সরল জীবন যাপন করতেন। আহার-নিদ্রা-বেশ-ভূষায় সাদাসিদা ও পবিত্র ছিলেন। তাঁর যুগের লোকেরা মদ্যপান করতো এবং পানাসক্তে এত বিভোর ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ মদ্যপানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা কোরে আদেশ জারি করেন এবং মদ্য প্রস্তুত নিষিদ্ধ করেন (শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবৎ ধর্ম-১৩৫পৃ.)।

➪ মহামানব শ্রীকৃষ্ণ ধর্মীয় রীতি-নীতি শাস্ত্র মতই পালন করতেন। প্রতিদিন সকালে 'ব্রহ্ম মূহূর্তে' (ফজরওয়াক্তে) শয্যা ত্যাগ কোরে হাত-মুখ ধৌত করতঃ (আচমন-ওজু) অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত পরমাত্মাকে (আল্লাহকে) ধ্যান (যেকর, প্রার্থনা, উপাসনা) করতেন। ঐ পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম, যিনি স্বয়ং জ্যোতি (নূর), অব্যয়-নিত্য (হাইয়্যুল কাইয়্যুম) ও নিষ্কলঙ্ক (সোবহান)। সন্ধ্যাকালে উপাসনা করতেন (বিষ্ণুভগবৎ পুরাণ)। তিনি রাত্রের অর্ধযাম বাকী থাকতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সনাতন ব্রহ্মকে (পরম প্রভু) ধ্যান করতেন (মহাভারত-১২/৫৩/১-২)। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'ব্রহ্ম' অর্থ- বৃহৎ যা আরবীতে 'আকবর' বলে, মহান আল্লাহ নিজেই সাদৃশ্যহীন "বৃহৎ সত্ত্বা"। আল্লাহ বিরাট বা মহান, যাকে মুসলমানগণ আরবীতে "আল্লাহু আকবর" বলে থাকেন।

➪ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য নবী-রসুলদের মত তাঁর সদৃশ রূপবান, বলবান, বীর্য্যবান, সর্বশাস্ত্র কুশলীরাজ ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন এবং অন্যান্য মহৎগুণ সমৃদ্ধ এক পুত্র সন্তানের জন্য প্রভুর দরবারে তপস্যা করেছিলেন' (হরিবংশ-৩/৭৩)। উপরের প্রার্থনা হতে বুঝা যায় যে, সৎ পুত্র কামনা করা প্রেরিত নবী-রসুলদের চিরায়ত রীতি, যা ইব্রাহীমও (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ১০১ মতান্তরে ১০৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন (দেশ পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪)।

এমন প্রমাণ আরও বহু দেওয়া যাবে, কিন্তু সত্যান্বেষী মনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জন্ম-মৃত্যু, ঘর সংসার, পরিবার-পরিজন পরিচালনা, সাধনা-উপাসনা, আদর্শ সমাজ সংস্কার, সত্য-ধর্মের সেবা, প্রয়োজনে মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শে বিশ্বাসী ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ও সবকিছু মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর যুগের একজন প্রেরিত-পুরুষ, মহামানব পথ-প্রদর্শক, নবী-অবতাররূপেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও যামানার এমামের অনুসারী
[যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১]

ভারতীয় অবতারদের প্রসঙ্গে কেন লিখছি?

হুমায়ূন কবীর

শুরুতেই একটি বিনীত কৈফিয়ত, আমি যে বিষয়টি নিয়ে লিখছি, এটা লিখতে যে অগাধ জ্ঞানের প্রয়োজন আমার তার ছিটেফোঁটাও নেই। আমি এই বিষয়ের একজন শিক্ষার্থী মাত্র। তবু সাহস কোরে "ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?" শিরোনামে একটি লেখা কিছুদিন আগে পত্রিকায় প্রকাশ কোরেছি। নিবন্ধটিতে আমি মনু, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, মহাবীর, বুদ্ধ এই মহামানবেরা যে আল্লাহর প্রেরিত অবতার অর্থাৎ নবী-রসুল ছিলেন এই বিষয়টি আশা করি পাঠকদের সামনে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ, তথ্য, উপাত্ত দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ কোরতে সক্ষম হোয়েছি। পাঠকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে অসংখ্য ফোন পেয়েছি যা এ বিষয়টি নিয়ে আমাকে আরও বিস্তারিত লেখার উৎসাহ যুগিয়েছে। পাল্টা মতও দিয়েছেন অনেকে, অনেকে কিছু তথ্যবিচ্যুতি ধোরিয়ে দিয়ে উপকার কোরেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এঁরা নবী ছিলেন এই বিষয়টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কি? আমরা কেন নতুন কোরে একটি 'সাম্প্রদায়িক বিতর্কের' জন্ম দিচ্ছি? এই প্রশ্ন হয়তো আরও অনেক পাঠকের মনেই জেগেছে। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পাঠকদের জানানো প্রয়োজন মনে কোরছি।

প্রথমত যে জিনিসটা বোলতে চাই, এই উপমহাদেশসহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি এক ধর্মের অনুসারীদের অজ্ঞতা এবং ভুল জানার কারণে তারা এক ধর্মের অবতারদেরকে, মহাপুরুষদেরকে আরেক ধর্মের ধর্ম গুরুরা, ধর্ম ব্যবসায়ীরা অসম্মান করেন, অপমান করেন, গালাগালি করেন। এটা দুনিয়াময় ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বীজ। আমরা বিশ্বাস কোরি প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যদি অন্য ধর্মের প্রভু এবং অবতারদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে এবং তাদের প্রতি হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করে তবে সাম্প্রদায়িকতার অপচর্চা বন্ধ হোতে বাধ্য। একটি উদাহরণঃ ইউরোপে খ্রিস্টানরা যে ইহুদিদের উপরে হামলা চালিয়ে গত ১৯০০ বছর ধোরে লক্ষ লক্ষ ইহুদি হত্যা কোরেছে, তাদেরকে বিতাড়িত কোরেছে এ সবকিছুর গোড়ায় কারণ ছিল ইহুদিরা ঈসা (আ:)-কে জারজ সন্তান এবং মা মরিয়মকে ভ্রষ্টা বোলে অপবাদ দিয়ে থাকে, এবং খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে ইহুদিরা ঈসা (আ:)-কে ক্রুশবিদ্ধ কোরে হত্যা কোরেছে। একইভাবে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা আমাদের নবী মোহাম্মদ (দ:) কে নবী হিসাবে অস্বীকার করে। তাদের অনেকে এতটাই এসলাম-বিদ্বেষী যে কার্টুন, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, চিত্রকলা দিয়ে প্রায়ই এসলামের নবীকে এবং পবিত্র কোর'আনকে অবমাননা কোরে চোলছে যার ফলে অসংখ্য দাঙ্গায় প্রাণহানী, রক্তপাত ঘোটেছে, আজও সেই আগুন জ্বলে যাচ্ছে কোটি এসলামপ্রিয় মানুষের হৃদয়ে। কিন্তু গত ১৪০০ বছরে একজন মোসলেমও ঈসা (আ:)-কে নিয়ে কোন কটূক্তি কোরেছে বোলে কেউ দেখাতে পারবে না। কিন্তু হিন্দুধর্মের যাঁরা অবতার তাদের ব্যাপারে মোসলেমদের সঠিক জ্ঞান নেই। ফলে তাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে সেই মহামানবদের হেয় কোরে কথা বোলেছে, হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে। এই কাজটি হিন্দুরাও কোরেছে। আফগানিস্তানে যে তালেবানরা মহামতি বুদ্ধের মূর্তি ধ্বংস কোরেছেন তারা যদি জানতেন যে এই বুদ্ধ

আল্লাহরই প্রেরিত পুরুষ তাহোলে কি তারা এই কাজ কোরতে পারতেন? এই হোচ্ছে ভারতীয় নবীদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার পেছনে আমার প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হোচ্ছে, সমস্ত দুনিয়ায় অন্যায়-অবিচার, অশান্তির মূল হোচ্ছে ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'। আত্মাহীন, স্রষ্টাহীন, নৈতিকতাহীন, দেহসর্বস্ব এই বস্তুবাদী সভ্যতাকে সব ধর্মের লোকেরাই অবলীলায় গ্রহণ কোরে নিয়েছেন এবং দাজ্জালের সংস্কৃতি গোগ্রাসে গিলছেন। তাদের উচিত ছিল তাদের সামষ্টিক জীবন পরিচালনা করার জন্য জীবনবিধান দিতে যে মহামানবদেরকে স্রষ্টা আল্লাহ পাঠিয়েছেন, সেই অবতারের শিক্ষা তাদের গ্রহণ করা। তা না কোরে সবাই যার যার ধর্মীয় শিক্ষাটাকে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ কোরে রেখেছেন। কেউ মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়েছেন, কেউ মসজিদে ঢুকিয়েছেন, কেউ প্যাগোডায় ঢুকিয়েছেন, কেউ ঢুকিয়েছেন গির্জায়। তারা তাদের অবতারদের শিক্ষাকে গ্রহণ করেন নি। তারা যদি তাদের সেই অবতারদের শিক্ষাকে গ্রহণ করে নেয় তাহোলে মানুষ মুক্তি পাবে। তারা যদি প্রত্যেকে সত্যসন্ধানী মন নিয়ে তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে প্রণিধান করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের ধর্মের ধারাবাহিকতাই হোচ্ছে এসলাম নামক দীনটি। বিশ্বধর্মগুলির ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী উৎকলিত আছে সেখানেও এই শেষ এসলামের এবং শেষ নবীর উল্লেখ রোয়েছে। তাদের অবতারগণ এই শেষ নবীর অনুসারী হওয়ার জন্য নিজ জাতিকে হুকুম দিয়ে গেছেন। অন্য ধর্মের অনুসারীরা যদি শেষ ধর্মগ্রন্থ কোর'আন পাঠ করে এবং এর বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করে তাহোলে খুব সহজেই তারা বুঝতে সক্ষম হবেন যে কোর'আন একটি ঐশীগ্রন্থ। সুতরাং মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি বাধা অপসারিত হবে। এখানে আমরা ভারতীয় নবীদের কথা বোলতে পারি। সনাতন ধর্মের বহু ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন নামে শেষ নবীর উল্লেখ রোয়েছে, যেগুলিতে শেষ নবীর জীবনের বহু ইতিহাস ও লক্ষণ তুলে ধরা হোয়েছে যা দিয়ে কোন সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এসলামকে সত্যদীন বোলে স্বীকার কোরতে বাধ্য হবেন। বেদে পুরানে শেষ নবীকে কোথাও বলা হোয়েছে কল্কি অবতার, কোথাও নরাশংস, কোথাও অন্তীম ঋষি, বৌদ্ধ ধর্মে তাঁকেই বলা হোয়েছে মৈত্তেয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরবর্তীতে লেখার আশা রাখি। এ বিষয়গুলি সম্পর্কে জনসাধারণ বিশদভাবে অবগত নন, কারণ সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই একটি পুরোহিত শ্রেণি জন্ম নিয়েছে যারা ধর্মকে নিজেদের কুক্ষিগত কোরে রেখেছে। তারা ধর্মের ইজারা নিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কোরে রেখেছে। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের উচিৎ নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। তাহোলে বিকৃতির ঘন অন্ধকারের মধ্যেও কিছু মহাসত্যের আলোকচ্ছটা অবশ্যই তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। এই সত্যসন্ধানে সাহায্য করার জন্য সেই ধর্মগ্রন্থের উক্তিগুলি পাঠকের সামনে আমরা তুলে ধোরছি। সুতরাং প্রত্যেকের প্রথম করণীয় হোচ্ছে নিজ ধর্মের অবতারদের নির্দেশ মান্য কোরে তারা আখেরী যুগে (কলিযুগে, Last Hour) যে অবতার ১৪০০ বছর আগেই আগমন কোরেছেন সেই নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুসারী হওয়া। যদি নিজ ধর্মের অবতারদেরকে তারা সম্মান কোরেই থাকেন তাঁর নসিহত অবশ্যই তাকে শুনতে হবে।

সুতরাং ভারতীয় নবীদের প্রকৃত পরিচয় ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাসের গহ্বর থেকে তুলে এনে তাঁদেরকে সঠিক স্বীকৃতি দিয়েছেন এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। আমরা সেই সংবাদ কেবল তুলে ধোরছি প্রধানত দু'টি উদ্দেশ্যে, (এক) অন্য ধর্মের অবতাররাও যে একই স্রষ্টার প্রেরিত নবী ও রসুল এই সত্য না জানার কারণে মানুষ তাঁদেরকে অশ্রদ্ধা ও অবমাননা করে এবং তাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি করে, এটা সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও হিংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই একই বাবা মায়ের সন্তান, তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ একই ধর্ম পাঠিয়েছেন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে কিছু বিধানের পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মের মর্মবাণী ছিল এক - আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, লক্ষ্য ছিল এক - শান্তি, এবং ধর্মগুলির প্রবর্তকেরা সবাই ছিলেন এক স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এই সত্য মেনে নিলে ধর্মীয় সহিংসতার কোন সুযোগ থাকবে না।

(দুই) সকল ধর্মের মানুষের উচিৎ নিজেদের ধর্মের অবতারদের নির্দেশ মোতাবেক শেষ রসুলের (দঃ) আনীত সিস্টেম গ্রহণ কোরে নেওয়া। আমরা জানি, আপনাদের ধর্মগুলিতে জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন নেই, যে বিধানগুলি আপনাদের ধর্মে আছে সেগুলিও কালপরিক্রমায় বিকৃত হোয়ে গেছে। সুতরাং ইচ্ছা কোরলেও আপনাদের ধর্মগুলি দিয়ে জাতীয় জীবন চালাতে পারবেন না। সেজন্যই ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা'র গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্রের শরণাপন্ন আপনারা হোয়েছেন। তার পরিণামও দেখতে পাচ্ছেন, বিশ্বজুড়ে জ্বলছে অশান্তির আগুন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর শেষ প্রেরিতের মাধ্যমে যে জীবনব্যবস্থাটি দান কোরেছেন এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এই দীন। বৈদিক যুগে শাস্ত্র দিয়ে রাজারা রাজ্য শাসন কোরতেন, তখন মানুষ তো বটেই একটি কুকুরের উপরও অন্যায় করা হতো না। সেটা ছিল সত্যযুগ, যার বর্ণনা আপনাদের ধর্মগ্রন্থাদিতে আছে। সেই শান্তি আবারও আসবে যদি মানবজাতি আবারও আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম গ্রহণ কোরে নেয়। তাহোলেই আপনারা হবেন সনাতন ধর্মের সত্যিকার অনুসারী।

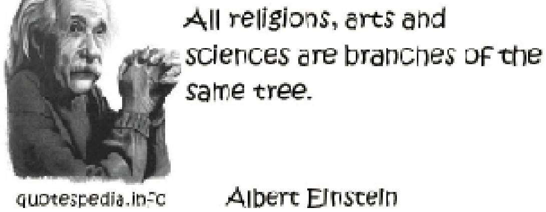

একদা কর্ম চঞ্চল মসজিদ আজ তালাবদ্ধ

মেজবাহ উল এসলাম

মসজিদ আল্লাহর বড়ত্বের, শ্রেষ্ঠত্বের তথা সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের চর্চাকেন্দ্র মসজিদ। এখান থেকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের, সার্বভৌমত্বের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মানুষ তাঁর খলিফা-প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালিত করা হতো। এটি দুনিয়াতে মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রশাসনিক দপ্তর। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পার্থিব কার্যালয় ও আনুগত্যের প্রশিক্ষণ-গৃহরূপে মসজিদের যে প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার কথা চিন্তা কোরে রসুল (সাঃ) এসলামের আকীদা মোতাবেক মদীনায় হেজরতের সাথে সাথে সর্বাগ্রে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নিজে ইট পাথর টেনে কায়িক শ্রমেও অংশ নিলেন। আখেরী নবী (সাঃ) মসজিদের পূর্ণ হক আদায় কোরেছিলেন। হক আদায় বলতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধান তথা বিচারাদি নিষ্পত্তির কেন্দ্র হিসাবে বিচারালয়ে পরিণত হোলো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কেন্দ্রীয় কোষাগারে পরিণত হোলো, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ সভার স্থানে পরিণত হল, রাজনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে বিভিন্ন রাজা বাদশা ও গোত্রপতিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে দূত প্রেরণ ও বৈদেশিক দূতদের সাক্ষাৎকার প্রদান, তাদের থাকা খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার স্থান হিসাবে মসজিদ এক দূতাবাসে ও অতিথি ভবনে পরিণত হোলো, সামরিক বিষয়াদির আলোচনা, সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ সামগ্রী- তলোয়ার, বল্লম, তীর, নেজা ইত্যাদির এক মজুদগার হিসাবে এক ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হোলো, মসজিদ ছিল সামাজিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম ছিল না কিন্তু বর্তমানে হারাম বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। মসজিদ ছিল এক সময় বিচারালয়। সেখানে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাদির বিচার ফয়সালা করা হতো এবং কেউ দোষী সাব্যস্ত হোলে সপ্তাহের শুক্রবার জুম'আর শেষে প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে রায় বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা হতো। মসজিদের সম্মুখস্থ বারান্দার ফাঁকা জায়গায় শরীর গঠনমূলক দৌড়, কুস্তিসহ বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হতো। এছাড়াও তীর বল্লম নেজা ইত্যাদি চালনার প্রতিযোগিতা হতো। কিন্তু বর্তমান মসজিদগুলোর দিকে তাকালে কোন মিল খুঁজে পাওয়াতো যায়ই না বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। বহু তলা বিশিষ্ট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল বিশাল মসজিদ নামাজের নির্দিষ্ট সময়টুকু ছাড়া সারাদিন তালাবদ্ধ অবস্থায় কবরগাহের নিস্তব্ধতা নিয়ে পড়ে থাকে। সমাজে অনৈক্য, ঝগড়া-বিবাদের রেশ ধোরে বহু মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অপরের জমি দখল কোরে সেখানে মসজিদ তৈরির ঘটনাও বিরল নয়। যেখানে চোর ডাকাতের বিচার কার্যকর করা হত এখন চুরির ভয়ে সেখানকার দরজা তালাবদ্ধ কোরে রাখা হয়। নামাজের সময় নোংরা জুতাজোড়া চুরির ভয়ে সেজদার জায়গায় রাখতে হয়। আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শনের স্থান তথা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের প্রশাসনিক দপ্তর মসজিদকে মো'মেনগণ সর্বসময়ে তার সঠিক অবস্থানে ধরে রাখতে পারে নি। এবলিসের অনুচর কাফের-মোশরেকগণ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পতন ঘটিয়ে অনেক সময় এ মসজিদের পরিচালনার দায়িত্ব পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়। যেমনটি আখেরী নবীর (সাঃ) বিজয় লাভের আগে পবিত্র কাবা ঘরের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। মক্কী জীবনে মোশরেকদের দখলদারিত্ব থেকে নবী ও স্বল্প সংখ্যক মো'মেন সাহাবীগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি আজকের দুনিয়ার মসজিদ সমূহও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী ও মানুষের সার্বভৌমত্বের উপর আস্থাশীলদের দখলে ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আর কতদিন মসজিদ তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে। থাকবে নিষ্প্রাণ, নিস্তব্ধ, অচল।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে যামানার এমামের প্রস্তাবনার বিকল্প নেই

শক্তি-প্রয়োগে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়

মো: মসীহ উর রহমান

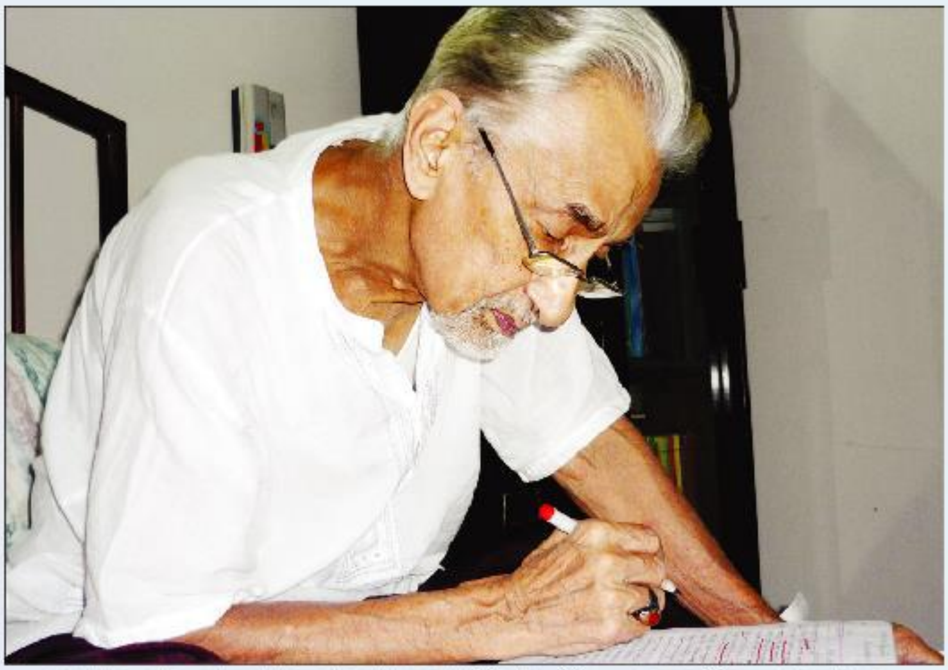

যামানার এমাম এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ২০০৯ সনে জঙ্গি সমস্যার সমাধানে সরকারকে সহায়তা করার প্রস্তাবনা পেশ করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক:
গত ২৮ আগস্ট, বুধবার বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল 'মাছরাঙা' -তে মধ্যরাতে "বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা"-র উপর একটি প্রাণবন্ত টকশো অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব:) আবদুর রশিদ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম এবং ডেইলি স্টার পত্রিকার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিভাগের প্রধান জুলফিকার আলি মানিক, স্কাইপি'তে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলী রিয়াজ। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ, এর নেপথ্য নায়কদের ভূমিকা, বিভিন্ন সময়ে ঘটা সহিংস হামলার ঘটনাগুলি, জঙ্গি দলগুলির অর্থায়নের উৎস, রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জঙ্গিদের যোগসাজস ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচকগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে প্রসঙ্গ আসে এই জঙ্গিবাদ থেকে মুক্তির পথ বা উপায় কি? এ প্রসঙ্গে পুলিস কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামের কয়েকটি কথা তুলে ধোরছি।

মনিরুল ইসলাম:
Terrorism (জঙ্গিবাদ অর্থে)-এর পিছনে একটি Ideology (আদর্শ) থাকে। Ideology-কে Ideology দিয়ে ফাইট করতে হবে। এটাকে বলা হয় War of Ideas (আদর্শিক যুদ্ধ)। তারা যে Ideology প্রচার করছে যেমন কোর'আনের আয়াত কিম্বা কোন হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা কোরে মানুষকে আকৃষ্ট কোরছে। এটার সঠিক ব্যাখ্যা জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। মোদ্দাকথা Awareness (সচেতনতা) একটি বড় ব্যাপার।

Awareness এর কাজটা পুলিশ বা Law Enforcing Agency করতে পারলে ভাল হত। **কিন্তু অন্যদেরও এগিয়ে আশা দরকার।**

এই প্রসঙ্গে হেযবুত তওহীদের আমীর মোহাম্মদ মসিউর রহমান -এর কথা

মনিরুল ইসলাম সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বোলেছেন। তার আগে মেজর জেনারেল (অব:) আবদুর রশিদ সাহেব বোলেছেন, 'পুলিশি কায়দায় জঙ্গিবাদ দমন শুদ্ধভাবে সম্ভব নয়'– আব্দুর রশীদের এই কথার সঙ্গে একমত পোষণ করেন মনিরুল ইসলাম।

ঠিক এই কথাটিই কয়েকবছর পূর্বে বোলেছিলেন হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি বোলেছিলেন, "পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র, তারাই সামরিক শক্তি দিয়ে জঙ্গিবাদ মোকাবেলা কোরতে পারছে না সেখানে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম একটি দেশের জন্য এটা আরও অসম্ভব"। তিনি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিতভাবে জঙ্গিদমনে সরকারকে সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ কোরেছিলেন। কারণ এই War of Ideas (আদর্শিক যুদ্ধ)-এ জঙ্গিদের পরাজিত কোরতে হোলে তাদের আদর্শের বিপরীতে অলঙ্ঘনীয় যুক্তি ও প্রমাণ দরকার, যা হোতে হবে অবশ্যই কোর'আন ও সুন্নাহ ভিত্তিক, সেই যুক্তি প্রমাণ আল্লাহ একমাত্র যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে দান কোরেছেন। এই যে পুলিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বোললেন, জঙ্গিরা কোর'আনের যে আয়াত কিম্বা যে হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা কোরে মানুষকে আকৃষ্ট কোরছে, সেগুলির সঠিক ব্যাখ্যা সকলকে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে, এই ব্যাখ্যা জানানোর জন্য তারা নির্ভর কোরছেন মাদ্রাসা শিক্ষিত মসজিদের এমাম আর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোচ্ছে, এভাবে জঙ্গিদেরকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয় সেটাও প্রমাণিত হোয়ে গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম নামধারী একটি শ্রেণি ধর্মকে জীবিকার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ কোরেছেন, এসলামের কাজ কোরে পার্থিব সম্পদ ও সুখ-সুবিধা হাসিল কোরছে যা আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (সুরা বাকারা ১৭৪ সহ বহু আয়াত)। যারা হারাম ভক্ষণ করে তাদের নৈতিক বল থাকে না, ধর্মীয় সততা থাকে না। তাছাড়াও মাননীয় এমামুয্যামান কোর'আন হাদীস, ইতিহাস থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ কোরেছেন যে, এই আলেমদের কাছে যে এসলামটি আছে সেটা একটি বিকৃত এবং বিপরীতমুখী এসলাম। সঠিক এসলাম তাদের কাছে থাকলে এই এসলামের নামে কেউ সন্ত্রাসী হোত না, কেউ ধর্মজীবীও হোত না। একজন অন্ধ পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কি কখনও আরেক পথভ্রষ্ট ও অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? অপরপক্ষে জঙ্গিরা একটি বিকৃত এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের পার্থিব জীবন ও সম্পদকে তুচ্ছ কোরছে, অনেকে নিজেদের বুকে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী হোচ্ছে। সুতরাং যাদের নিজেদেরই নৈতিকতা নেই, ধর্মীয় সততা নেই, সেই তথাকথিত ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের দ্বারা জঙ্গিবাদের মত আরেকটি ভ্রান্তপথকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করা, জঙ্গিদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা কষ্মিনকালেও সম্ভব হবে না। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, অন্যায় দিয়ে অন্যায় দূর হয় না, অন্ধকার দিয়ে অন্ধকারের মোকাবেলা হয় না। তাই ধর্মজীবী ও প্রচলিত এসলামের আলেমদের দিয়ে জঙ্গিবাদের মোকাবেলা করার চেষ্টা কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম (Fight With One's Own Shadow), অনর্থক অর্থব্যয় ও কালক্ষেপণ করা হবে।

উক্ত টক-শো'র আলোচকরাই এ কথা বহুবার বোলেছেন যে মাদ্রাসা-শিক্ষিত শ্রেণি থেকেই অধিকাংশ জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান হোচ্ছে। কাজেই মাদ্রাসা-শিক্ষিত আলেমদেরকে দিয়ে জঙ্গিবিরোধী প্রচারণা চালালে সেটা হবে একটি স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত তাছাড়া আগে বলা হোত শুধু গরিব শ্রেণি এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতদের থেকেই জঙ্গিদের উদ্ভব হোয়ে থাকে, কিন্তু এখন এ ধারণাও ভুল প্রমাণিত হোয়ে গেছে। অন্যতম আলোচক অধ্যাপক আলী রিয়াজ সুদূর যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস থেকে এই মতই দিলেন। তিনি বোললেন, "মাদ্রাসা থেকেই শুধু জঙ্গি তৈরি হয় তা কিন্তু নয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও এই প্রবণতা রয়েছে। এই প্রবণতা আপনি কেবল গ্রেফতার, রিমান্ড, কারাদণ্ড দিয়ে রোধ করতে পারবেন না। ওগুলো দিয়ে হবে না। এর বাহিরে Motivational কার্যক্রম সঠিক করতে হবে।" এখন যদি মাদ্রাসা শিক্ষিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠান দিয়ে Motivational কার্যক্রম চালানো হয় সেটা অতীতে যেমন কোন সুফল বয়ে আনে নি, ভবিষ্যতেও আনবে না। তাই মাননীয় এমামুয্যামান নিজে থেকে এগিয়ে গিয়েছেন এবং বোলেছেন, তাঁকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবে তিনি তাঁর কাছে থাকা কোর'আন ও হাদীসভিত্তিক সেই যুক্তি ও প্রমাণগুলি তুলে ধোরে জঙ্গিদেরকে ভ্রান্তপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এনশা'আল্লাহ। কিন্তু সরকার তাঁর প্রস্তাবনায় কোন সাড়া দেয় নি। পরবর্তীতে তিনি প্রশাসনের উচ্চস্তর থেকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যন্ত সর্বস্তরে সেই প্রস্তাবনার অনুলিপি পৌঁছে দেন। আজ যখন আবার রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল পদে আসীন ব্যক্তিগণ অনুভব কোরছেন যে তাদের আদর্শিক যুদ্ধে অন্যদেরও এগিয়ে আসা, অংশ নেওয়া প্রয়োজন তখন এমামুয্যামানের সেই প্রস্তাবনাটি বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব কোরছি।

মাননীয় এমামুয্যামানের সেই প্রস্তাবনা-পত্র

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

২২/০৪/২০০৯ ঈসায়ী

মাননীয়া,
প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মহোদয়া,
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে,

বর্ত্তমানে সারা বিশ্ব এক মহা সংকটকাল অতিক্রম কোরছে। সন্ত্রাসবাদ, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি কারণে সমগ্র বিশ্ব চরম অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে পতিত হোয়েছে। বিশেষ কোরে এসলামিক সন্ত্রাসবাদ প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্বকে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের দেশও এ সমস্যার বাইরে নয়। বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মোকাবেলায় তারা শক্তিপ্রয়োগকে *(Violence)* নীতি হিসাবে গ্রহণ কোরেছে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরও এই পথে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হোচ্ছে না; বরং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে *(War on terror)* যে জয়ের ব্যাপারে তারা একসময় নিশ্চিত ছিল তা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রশ্নটি হোচ্ছে-

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সফলতা আসবে কি?

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি তাদের বিশাল শক্তি, অর্থ ব্যয় করে বিশ্বময় সন্ত্রাস মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও বক্তব্যের মধ্যেই তাদের ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠছে। তাদের অধিকাংশই একমত যে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নেতৃত্বদানকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্প্রতি সি.বি.এস টেলিভিশনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার কোরেছেন যে, *US Afghan plan must have 'exit strategy.'* **যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান থেকে নিরাপদে চলে আসার পথ সুগম করতে হবে।**[১]

একই মত প্রকাশ কোরেছেন আফগান যুদ্ধে নিয়োজিত ব্রিটিশ সেনা সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মার্ক কার্লটন স্মিথ। তিনি বলেন যে, *"The Afghan war is un-winnable.* অর্থাৎ- **আফগান যুদ্ধে কোনভাবেই জেতা সম্ভব নয়।**[২] পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক রিচার্ড হলব্রুকও আফগান যুদ্ধের জয় সম্পর্কে একই মত প্রকাশ কোরেছেন- *First of all, the victory, as defined in purely military terms, is not achievable* অর্থাৎ প্রথম কথাই হোচ্ছে, সামরিক পরিভাষায় জয় বোলতে যা বোঝায় এখানে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।[৩] এ যুদ্ধে যৌথবাহিনীর সহায়ক শক্তি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীও বোলেছেন, *US failed to accomplish desired goals so far in Afghanistan* অর্থাৎ আফগানিস্তানে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হোয়েছে।[৪]

শক্তিপ্রয়োগ করে সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রচেষ্টা যে শুধু সফলই হোচ্ছে না, তাই নয় বরং ইরাক, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তানসহ যেখানেই যত বেশী শক্তিপ্রয়োগ করা হোয়েছে সেখানেই সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন ও বেপরোয়া আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হোয়ে পোড়েছে। মার্কিন নেভাল পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলের সমর বিশেষজ্ঞ মি. আরকুইলা সন্ত্রাসী হামলার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সম্পর্কে বোলেছেন যে, *"It is most curious that the areas where we have military operations have the most attacks."* অর্থাৎ--এটা সাংঘাতিক অনুসন্ধানজ্ঞাপক বিষয় যে, যেখানেই আমরা সামরিক অভিযান চালিয়েছি সেখানেই আমাদের উপর সবচেয়ে বেশী হামলা করা হোয়েছে।[৫] গত দুই বছরেরও কম সময়ে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় ১৭০০ মানুষ নিহত হোয়েছে।[৬] বিগত কয়েকমাসে এ হামলার পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। পাশাপাশি যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসবিরোধীদেরকে নাজেহাল কোরে ফেলছে তা হলো আত্মঘাতী বোমা হামলা।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে দুর্বল কোরতে সর্বত্রই সন্ত্রাসীরা আত্মঘাতী হামলার কৌশল অবলম্বন কোরেছে। প্রায় প্রতিদিনই বিশ্বের কোথাও না কোথাও আত্মঘাতী বোমা হামলা চোলেছেই। দিন দিন এ ধরণের হামলার তীব্রতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শুধু এক ইরাকেই আত্মঘাতী বোমা হামলা হোয়েছে মোট ১২৬০টিরও উপরে অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে ২০৯টিরও বেশী। একই বছরে এ ধরণের হামলা হোয়েছে সর্বোচ্চ ৪৭৮টি।৭ এ হামলাগুলি যে শুধুমাত্র তরুণরা কোরছে তা নয়। সব ধরণের মানুষ, বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের পুরুষ ও নারী নিজেদের শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, এমনকি অনেক গর্ভবতী নারীও আত্মঘাতী হোয়েছেন। সন্ত্রাসীদেরকে দমন করার জন্য যারা মরিয়া তাদের সবাই এখন একবাক্যে স্বীকার কোরছেন যে তাদের পক্ষে আত্মঘাতী হামলা বন্ধ করা সম্ভব নয়, নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়। কাবুলে নিয়োজিত ন্যাটো পরিচালিত *International Security Assistance Force (ISAF)* এর মুখপাত্র মেজর ল্যাক নিটিং বলেছেন, *"It is simply impossible for law enforcement agencies to prevent suicide attacks since they could not be predicted and, therefore, not to be averted."* অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির পক্ষে আত্মঘাতী বোমা হামলা বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। যেহেতু কখন হামলা হবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না, তাই এটি এড়ানোও সম্ভব নয়।[৮]

কল্পনাতীত ব্যয়:

গত প্রায় ৭/৮ বছর ধোরে পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হোচ্ছে তা আমাদের ধারণারও অনেক বাইরে। ২০০৮ সনে শুধু ইরাক যুদ্ধের পেছনে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মাসে ১২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হোয়েছে। এ যুদ্ধে তাদের এ যাবত ব্যয় হোয়েছে মোট ৬,৪৯,৪৮,৪২,২৩,৩৫৮ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪,৫৪,৬৩,৮৯,৫৬,৩৫,০৬০ টাকা। প্রতি সেকেন্ডে ব্যয় হোচ্ছে ৫,০০০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩,৫০,০০০ টাকা। প্রতি মার্কিন সৈন্যের জন্য এক বছরে খরচ হয় ৩,৯০,০০০ ডলার বা দুই কোটি তেহাত্তর লক্ষ টাকা (প্রতি মার্কিন ডলার ৭০ টাকা হিসাবে)।৯ আফগান যুদ্ধে ব্যয় হোয়েছে এর চেয়ে আরো অনেক বেশী, কারণ সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হোয়েছে তারও দুই বছর আগে। আজ সারা দুনিয়া যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হোয়েছে এ বিপুল অর্থব্যয় তার অন্যতম প্রধান কারণ।

সুতরাং সন্ত্রাসবিরোধী এ যুদ্ধের নেট ফল হোচ্ছে--সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ কোরে, অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ ব্যয় কোরেও সন্ত্রাসীদেরকে দমন তো করা যাচ্ছেই না বরং তাদের হামলা উত্তরোত্তর বেড়েই চোলেছে এবং এ যুদ্ধের ব্যয় যোগাতে গিয়ে সারা বিশ্ব চরম অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হোয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মিডিয়াগুলিও নিরবচ্ছিন্ন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোচ্ছে না। ক্রমশই দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ বিস্তার লাভ কোরছে। ব্রিটেনের একটি স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা গেছে ২০০৮ সালের জুন মাসে সেখানে মাত্র ১০টি শিশুর সন্ত্রাসী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অথচ মাত্র ৯ মাস পরে এমন শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ তে।[১০] খোদ ব্রিটেনের যদি এই অবস্থা হোয়ে থাকে তাহোলে মোসলেমপ্রধান দেশগুলির অবস্থা কি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ দশকের শুরু থেকেই কতগুলি সংগঠন আমাদের দেশেও তাদের উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম আরম্ভ কোরেছে। আজ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সন্ত্রাসী হামলা হোয়েছে, সারা দেশের প্রায় সবকটি জেলায় সন্ত্রাসীরা একযোগে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, অনেকগুলি আত্মঘাতী বোমা হামলাও সংঘটিত হোয়েছে, অনেক নিরীহ মানুষ হতাহত হোয়েছেন। আমাদের দেশেও তাদেরকে দমন করার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের মত শক্তি প্রয়োগের নীতিই *(Violence)* গ্রহণ করা হোয়েছে। সারাদেশ তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রপাতি উদ্ধার করা হোচ্ছে। সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ, শ্রম, সময় ব্যয় কোরে এবং মিডিয়ার নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের মাধ্যমে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগেও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অত্যাধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হোয়েছে,

এমন প্রায়ই হোচ্ছে। শক্তিপ্রয়োগ কোরে চরমপন্থীদের দমন করার চেষ্টার ব্যর্থতা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে পশ্চিমা শক্তিগুলির ও পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের পরও ১৩/০৪/২০০৯ তারিখে পাকিস্তানকে তালেবানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আসতে হোয়েছে এবং পাকিস্তান সরকার সোয়াতে এসলামী শরীয়াহ আইন চালুর অনুমোদন দিতে বাধ্য হোয়েছে। এভাবে সারা পৃথিবীতেই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় দমননীতি ও সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হবার পর সকলেই এখন বিকল্প পথ খুঁজছে।

শক্তিপ্রয়োগের বিকল্প পথ খুঁজছে পশ্চিমা বিশ্বঃ

যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে কি কল্পনাতীত পরিমাণ অর্থ ব্যয় কোরে চোলেছে তার পরিসংখ্যান একটু আগেই দিলাম। তাদের মত মহাশক্তির পক্ষেও আর সম্ভব হোচ্ছে না এ যুদ্ধ বেশীদিন চালিয়ে যাওয়া কারণ যুদ্ধের সীমাহীন ব্যয় মেটাতে গিয়ে তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও দিন দিন আরো সংকটজনক হোয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হোয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী শক্তি প্রয়োগের *(Violence)* বিকল্প পথ খুঁজছে। ২০০৭ এর গোড়ার দিকেই মার্কিন নেভাল পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলের সমর বিশেষজ্ঞ মি. আরকুইলা ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসী হামলার পরিসংখ্যান সম্পর্কে বলেছিলেন যে, *"These statistics suggest that our war on global terrorism is not going very well. It suggests we need to try a new approach."*

অর্থাৎ-- এ পরিসংখ্যান আমাদেরকে বলে দেয় যে, বিশ্বব্যাপী যে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ আমরা শুরু কোরেছি তার অবস্থা খুব ভালো নয়। এ পরিসংখ্যান আরো বলে যে **এখনই আমাদের বিকল্প কোন পথে চেষ্টা চালানো দরকার।**[১১]

অতি সম্প্রতি ব্রিটিশ সেনা সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মার্ক কার্লটন স্মিথ ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত কোরতে গিয়ে বলেন যে, *"The war against the Taliban cannot be won. British public should not expect a 'decisive military victory' but should be prepared for a possible deal with the Taliban.* অর্থাৎ- তালেবানদের সাথে যুদ্ধ কোরে জেতা যাবে না। তাই ব্রিটিশ নাগরিকদের এ যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় আশা করা ঠিক হবে না, **বরং তালেবানদের সাথে সম্ভাব্য কোন আপোষ-মীমাংসায় আসা হতে পারে** এমনটি দেখার জন্যই তাদের প্রস্তুত থাকা উচিৎ হবে।১২ অর্থাৎ তিনিও যুদ্ধ ছাড়াও বিকল্প পথের কথা ভাবছেন। এমন কি ২৮ মার্চ, ০৯ তারিখে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে তার নতুন রণকৌশল *(New Strategy)* প্রসঙ্গে বলেন, *A campaign against extremism will not succeed with bullets or bombs alone.* অর্থাৎ চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে শুধু বুলেট ও বোমা দিয়ে সফল হওয়া যাবে না।[১৩]

যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মত মহা পরাশক্তি সন্ত্রাস দমন কোরতে পারছে না এবং শক্তি প্রয়োগের বিকল্প পথ চিন্তা কোরছে সেখানে আমাদের মত দরিদ্র দেশের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আর যুক্তরাষ্ট্র এ অভিযানে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় কোরছে আমাদের পক্ষে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থও ব্যয় করা সম্ভব নয়। **এ পরিস্থিতিতে আমরা কি এখনও শক্তি প্রয়োগের পথে সন্ত্রাসীদেরকে দমনের চেষ্টা চালিয়ে যাবো, নাকি আমাদেরও উচিৎ বিকল্প পথের অনুসন্ধান করা?**

বিকল্প পথ আছে কি?

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, পৃথিবীতে মোসলেম বোলে পরিচিত ১৫০ কোটির যে জনসংখ্যাটি আছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আন্তরিকভাবে চায় যে তাদের জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠিত হোক। এসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এমনভাবে অনুপ্রাণিত *(Motivated)* ও সংকল্পবদ্ধ *(Determined)* যে তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ কোরে দিয়েছেন। তারা কোন পার্থিব স্বার্থে এ পথ বেছে নেন নি। তারা আল্লাহকে, আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসেন ও পরকালে বিশ্বাস করেন। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ কোরতে পারলেই তারা চূড়ান্ত সফল, এর বিনিময়ে তারা আখেরাতে জান্নাতে যেতে পারবেন। এজন্য তারা শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন কোরে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হোচ্ছেন না, এবং এমন লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চোলছে। **প্রকৃত এসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা (আকীদা) ভুল ও বিকৃত হওয়ার কারণে তারা বুঝতে পারছেন না যে, তারা যে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ কোরেছেন সেই পথে চোললে তারা দুনিয়াও পাবেন না, আখেরাতও পাবেন না অর্থাৎ দুই কূলই হারাবেন।** যতদিন তারা তাদের এই ভুল না বুঝতে পারবেন ততদিন শক্তি প্রয়োগ কোরে বড়জোর তাদের কার্যক্রমকে কিছু সময়ের জন্য স্তিমিত করা যেতে পারে, বন্ধ করা যাবে না। তার প্রমাণ হোচ্ছে ২০০২ সালে আমেরিকা যখন আফগানিস্তান আক্রমণ কোরল মাত্র কিছুদিনের মধ্যে তালেবানরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোয়ে পালিয়ে গেল। আমেরিকা সেখানে তার অনুগত সরকার নিয়োগ দিল এবং দাবী কোরল, আফগান যুদ্ধে তালেবানরা চূর্ণ-বিচূর্ণ *(Crushed)* হোয়ে গেছে, তারা আর দাঁড়াতে পারবে না। তাদের এ কথা বাকী বিশ্ব মেনে নিল। অথচ তার সাত বছর পর এসে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সেনাপ্রধান থেকে শুরু কোরে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাই এখন বোলছেন, আফগানিস্তানে তালেবানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তাই তারা সেখান থেকে চোলে আসার পথ খুঁজছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উল্লেখিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাত বছর আপ্রাণ যুদ্ধ চালিয়ে আজ মহা পরাশক্তিগুলি কার্যতঃ তাদের হার স্বীকার কোরে নিচ্ছে এবং সেখান থেকে চোলে আসার পথ খুঁজছে। ২০০৩ সালে ইরাক জয় করার কিছুদিন পরই যুক্তরাষ্ট্রের বিগত প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সদম্ভে ঘোষণা কোরেছিলেন যে, ইরাক যুদ্ধ শেষ। আজ ছয় বছর পরও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, প্রতিদিনই সেখানে গোলাগুলী, বোমাবাজি ও আত্মঘাতী বোমা হামলা চোলছেই। এই ১২ এপ্রিলও সন্ত্রাসীদের হামলায় সেখানে পাঁচজন আমেরিকার সৈন্য নিহত হোয়েছে।

তাহোলে বোঝা গেল সন্ত্রাসদমনের একটি মাত্র উপায় আছে, তা হলো- সন্ত্রাসীদেরকে যদি কোর'আন হাদীস থেকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তাদের পথটি এসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নয় এবং এ পথে জীবন দিয়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে না একমাত্র তাহোলেই তারা সন্ত্রাসের এই পথ ত্যাগ কোরবেন। এর আর কোন বিকল্প নেই। তারা যে ভুল পথে আছেন তা তাদেরকে বোঝানোর জন্য কোর'আন ও হাদীসভিত্তিক যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি আমাদের হাতে আছে। এগুলি তাদেরকে বোঝাতে পারলে আশা করা যায় তারা সন্ত্রাসী পথ ত্যাগ কোরবেন।

অতএব আমাদের প্রস্তাবনা হোচ্ছে...

আপনারা আপনাদের পছন্দনীয় কোন স্থানে আপনাদের হাতে গ্রেফতারকৃত এসলামী সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর মধ্য থেকে আপনাদের পছন্দমত বাছাই করা ব্যক্তিগণকে একত্রিত কোরবেন। তারা কারা হবেন এবং সংখ্যায় কতজন

হবেন তা আপনারাই স্থির কোরবেন। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা কোরব আমাদের কাছে থাকা সকল যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে বোমা মেরে, গুলি কোরে মানুষ হত্যা কোরে দেশ ও সমাজের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি কোরে এসলাম বা শান্তি আনা যাবে না। আমাদের হাতে থাকা কোর'আন ও হাদীসভিত্তিক যুক্তিগুলি তাদের সামনে উপস্থাপন কোরতে পারলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে সম্পূর্ণ না হোলেও তাদের অধিকাংশই সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ কোরে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে শান্তির ধর্ম এসলামের পথে আনার চেষ্টা কোরবে। আমরা যখন তাদেরকে বোঝাবো তখন প্রয়োজন হোলে আপনার প্রতিনিধিরা সেখানে থাকবেন, তারা শুনবেন আমরা সন্ত্রাসীদেরকে কি বলি, কি বুঝাই। সেখানে আপনাদের যতসংখ্যক ইচ্ছা নিরাপত্তাকর্মী রাখবেন। ইচ্ছা হোলে আমাদের বক্তব্য রেকর্ড কোরবেন।

এই উদ্যোগে যদি কাঙ্খিত সফলতা আসে তবে যারা এখনও গ্রেফতার হয় নি কিন্তু সন্ত্রাসী কার্য্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য যারা সন্ত্রাসী পথ অবলম্বন করার চেষ্টা কোরছে, আমাদের কাছে থাকা তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণ প্রকাশ্যে প্রচার কোরলে তারাও অবশ্যই তাদের ভুল পথ পরিত্যাগ কোরে শান্তির পথে আসবে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, আমার এ প্রস্তাবনা কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়। জাতির একটি অংশ আজ বিপথগামী হোয়ে নিরীহ মানুষজনকে হত্যা কোরছে এবং নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। এটা আমায় ব্যথিত কোরে দিয়েছে বোলেই আপনার কাছে আমার এই অকপট ও আন্তরিক নিবেদন। আমি আশা কোরছি, নিরীহ মানুষের প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমার এ প্রস্তাবনাটি আপনি বিবেচনা কোরে দেখবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায়।

ধন্যবাদান্তে,

[signature]

(মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী)
প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম: হেযবুত তওহীদ

তথ্যসূত্র:

১। বিবিসি ও এএফপি-র বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও *The Daly Star* ২৪ মার্চ, ২০০৯, পৃ: ১০

২। ১৪ মার্চ, ২০০৯, ইন্টারনেট, *www.paktribune.com*

৩। Washington, February 18, 2009 (AP), The NewsHour (Internet)

৪। ANI, Islamabad থেকে The Daily Star, ২৫, মার্চ, ২০০৯।

৫। ০১/০৫/২০০৭, New York Times, Internet

৬। AFP, PTI, Peshawar এর বরাতে The Daily Star-March, 30, 2009

৭। Wickipedia, 23/3/2009.

৮। ইন্টারনেট, www.paktribune.com

৯। Internet- Iraq War Results & Statistics as of February 18, 2009

১০। তথ্যটি প্রদান কোরেছেন ব্রিটেনের পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের পুলিসপ্রধান ও ব্রিটেনের সন্ত্রাসবিরোধী কার্য্যক্রমের নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীন কর্মকর্তা স্যার নরম্যান বেটিসন (ব্রিটেনের পত্রিকা Independent-এর বরাত দিয়ে আমাদের সময়, ২৯ মার্চ, ২০০৯ ইং)।

১১। 01/05/2007, New York Times, Internet

১২। ১৪ মার্চ, ২০০৯, ইন্টারনেট, www.paktribune.com

১৩। বিবিসি, The STAR, 3 April, 2009

মাননীয় এমামুয্যামান এই প্রস্তাবনা পেশ কোরেছিলেন ৪ বছর আগে। সর্বোচ্চ বল প্রয়োগেও বা অর্থব্যয় কোরে যে জঙ্গিবাদ দমন সম্ভব নয় সেটা এখন আর বিতর্কের বিষয় নেই, সেটা এখন স্বীকৃত বাস্তবতা। প্রাচীন চীনা সমরবিদ ও সেনানায়ক সান যু (Sun Tzu) বোলেছিলেন, "To fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting অর্থাৎ "যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভ করাই চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব নয়, শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিনা যুদ্ধে তছনছ কোরে দেওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব। আদর্শিক লড়াই (The Battle of Ideas) হোচ্ছে শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিনা যুদ্ধে তছনছ কোরে দেওয়ার একটি কার্যকরী পদ্ধতি। তাই প্রাসঙ্গিক কারণে যামানার এমামের সেই প্রস্তাবনাটি আমরা আবারও পেশ কোরছি। আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কেবলমাত্র মানবতার কল্যাণে আমাদের দেশকে (এবং মানবজাতিকে) জঙ্গিবাদের হুমকি থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ কোরতে চাই। আমরা সুস্পষ্টভাষায় বোলে দিচ্ছি, যে আদর্শে দিক্ষিত হোয়ে মানুষ বুকে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী হয় সেই পদ্ধতিকে ভুল প্রমাণ কোরতে যে শক্তিশালী যুক্তি (Anti-Logic), তথ্য ও প্রমাণ প্রয়োজন তা আছে কেবল এবং কেবলমাত্র হেযবুত তওহীদের কাছে। তাই জঙ্গিবাদ দমন হেযবুত তওহীদ ছাড়া সম্ভব না।

আবারও বোলছি, সকলকে মনে রাখা জরুরি, ধর্মব্যবসা যেমন এসলামে বৈধ নয়, তেমনি ধর্মীয় সন্ত্রাসও বৈধ নয়। তাই যে ধর্মজীবীরা নিজেই আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী অবৈধ কাজে লিপ্ত তাদের দ্বারা জঙ্গিবাদের মত আরেকটি ভ্রান্তপথকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আমরা নিশ্চিত কোরে বলতে পারি যারা যামানার এমামের আদর্শের অনুসারী হবেন তারা সর্ব রকমের জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ থেকে, সর্ব রকম অন্যায় থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে পারবে এনশা'আল্লাহ। তার একটি নিদর্শন হেযবুত তওহীদের গত ১৮ বছরের রেকর্ড। আদালতে প্রমাণিত হোয়েছে যে, আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য একটিও আইনভঙ্গ করে নি, একটিও অপরাধ করে নি। এটা সম্ভব হোয়েছে কেবলমাত্র এই কারণে যে, হেযবুত তওহীদ আল্লাহর প্রকৃত এসলামের অনুসরণ কোরছে। এটা ভুলে গেলে চোলবে না- শুধু এসলামের নামে বোমাবাজিই জঙ্গিপনা (Millitancy) নয়, সন্ত্রাস (Terrorism) নয়, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আদর্শের যে দলই হোক না কেন, কেউ যদি বোমা ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, মানুষ হত্যা করে সেটাও সন্ত্রাস। এই দেশকে আমরা কেবল এসলামী সন্ত্রাসবাদ নয়, সকল প্রকার সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা কোরতে চাই, কারণ সেই পদ্ধতি (System) মহান আল্লাহ মাননীয় এমামুয্যামানকে দান কোরেছেন।

আমরা আশা কোরব, সরকার যদি সত্যিই জঙ্গিবাদ সমস্যার সমাধান চান তবে আমাদের এই প্রস্তাবনাটি বিবেচনায় রাখবেন।

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৮৫৩৯৯৩২২২, ০১১৯১৩৬৭১১০]

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

সরল এসলামই সনাতন জীবনপথ

আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত এসলাম হোচ্ছে দেহ ও আত্মার ভারসাম্যযুক্ত, এর ভারসাম্য নষ্ট হোলে এটা আর টিকে থাকে না।

আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে শেষনবী (দ:) পর্য্যন্ত আল্লাহ যে জীবন বিধান মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন, স্থান, কাল ভেদে সেগুলোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও সর্বক্ষণ ভিত্তি থেকেছে একটি মাত্র। সেটা হোচ্ছে তওহীদ, একমাত্র প্রভু, একমাত্র বিধাতা (বিধানদাতা) আল্লাহ। যার আদেশ নির্দেশ, আইন-কানুন ছাড়া অন্য কারো আদেশ, নির্দেশ, আইন-কানুন কিছুই না মানা। একেই আল্লাহ কোর'আনে বোলছেন দীনুল কাইয়্যেমা। আল্লাহ মানুষের কাছে এইটুকুই মাত্র চান। কারণ তিনি জানেন যে, মানুষ যদি সমষ্টিগতভাবে তিনি ছাড়া অন্য কারো তৈরি আইন কানুন না মানে, শুধু তারই আইন-কানুন মানে তবে শয়তান তার ঘোষিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানুষকে দিয়ে অশান্তি, অন্যায় আর রক্তপাত অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং মানুষ সুবিচারে, শান্তিতে (এসলামে) পৃথিবীতে বসবাস কোরতে পারবে- অর্থাৎ আল্লাহ যা চান। কত সহজ। কাইয়্যেমা শব্দটা এসেছে কায়েম থেকে যার অর্থ চিরন্তন, শ্বাশ্বত, সনাতন। আল্লাহ এই দীনুল কাইয়্যেমার কথা বোলে বোলছেন- এর বেশী তো আমি আদেশ করি নি (সুরা আল বাইয়েনাহ ৫)। 'এর বেশী তো আমি আদেশ করি নি' তিনি বোলছেন এই জন্য যে, তিনি জানেন যে, ঐটুকু করলেই অর্থাৎ তার বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মানুষ না মানলেই মানব জাতির মধ্যে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সামান্য দাবীটুকুই তিনি মানুষের কাছে আদম থেকে আজ পর্য্যন্ত কোরে আসছেন। পূর্ববর্তী বিকৃত জীবন-ব্যবস্থাগুলিতেও আল্লাহর দাবী ছিলো ঐ সহজ সরল দাবী- দীনুল কাইয়্যেমা, তওহীদ। ভারতীয় ধর্মের অনুসারীদের তারা কোন ধর্মে বিশ্বাসী জিজ্ঞাসা কোরলে তার জবাব দেবেন সনাতন ধর্ম। সনাতন এবং কাইয়্যেমা একার্থবোধক- যা চিরদিন প্রবাহমান, চিরন্তন ও শ্বাশ্বত, এবং তা ঐ তওহীদ। এর গুরুত্ব এত বেশী যে একে আল্লাহ আমাদের জন্য শুধু প্রতি সালাতে নয় প্রতি রাকাতে অবশ্য কোরে দিয়েছেন সুরা ফাতেহার মধ্যে। "আমাদের সেরাতুল মুস্তাকীমে চালাও" মোস্তাকীম অর্থ সহজ, সরল ও শ্বাশ্বত।

> *পূর্ববর্তী বিকৃত জীবন-ব্যবস্থাগুলিতেও আল্লাহর দাবী ছিলো ঐ সহজ সরল দাবী- দীনুল কাইয়্যেমা, তওহীদ। ভারতীয় ধর্মের অনুসারীদের তারা কোন ধর্মে বিশ্বাসী জিজ্ঞাসা কোরলে তার জবাব দেবেন সনাতন ধর্ম। সনাতন এবং কাইয়্যেমা একার্থবোধক- যা চিরদিন প্রবাহমান, চিরন্তন ও শ্বাশ্বত, এবং তা ঐ তওহীদ। এর গুরুত্ব এত বেশী যে একে আল্লাহ আমাদের জন্য শুধু প্রতি সালাতে নয় প্রতি রাকাতে অবশ্য কোরে দিয়েছেন।*

এইখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এসে যায়, তাহলো আল্লাহ কোর'আনে আমাদের বোলে দিলেন যে, আমি তোমাদের একটি ভারসাম্যযুক্ত জাতি বানালাম (সুরা বাকারা-১৪৩)। এই ভারসাম্যের সাথে সেরাতুল মোস্তাকীম ও দীনুল কাইয়্যেমা সংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধ (Related, connceted)। সহজ, সরল, চিরন্তন ছাড়াও সেরাতুল মোস্তাকীম শব্দের এক অর্থ হলো, মধ্যবর্তী, মাঝামাঝি- ঐ ভারসাম্যেরই অন্য অর্থ। আল্লামা ইউসুফ আলী এর অনুবাদ কোরেছেন ১) Straight (সরল) ২) Standard (মাঝামাঝি, মধ্যপন্থী) ৩) Definite (স্থির, নিশ্চিত) Permanent (চিরস্থায়ী শ্বাশ্বত)।

Standard অর্থটির দিকে লক্ষ্য কোরুন। এর অর্থ হলো মধ্যবর্তী, মাঝামাঝি, মানে সর্বোৎকৃষ্টও নয়, সর্বনিম্নও নয়, সেই মধ্যপন্থী, ভারসাম্যযুক্ত। অর্থাৎ দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম আল্লাহ আমাদের

> ***একটা জাতির মধ্যে জ্ঞানী, চালাক, বোকা, সর্বরকম মানুষই থাকবে, সব নিয়েই একটি জাতি। সুতরাং লক্ষ্য যদি জটিল হয় তবে সবার তা বোধগম্য হবে না। জাতির যে অংশটুকু শিক্ষিত ও মেধাবী, শুধু তাদেরই বোধগম্য হবে- সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হোয়ে ঐ লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম কোরতে পারবে না।***

দিয়ে আসছেন মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে যা হোচ্ছে- ১) অত্যন্ত সহজ ও সরল, ২) মধ্যপন্থী ৩) চিরস্থায়ী শ্বাশ্বত। এবং যে জাতি একে গ্রহণ কোরবে সে জাতি হবে ভারসাম্যযুক্ত (উম্মাতাও ওয়াসাতা)। একটা জাতির মধ্যে জ্ঞানী, চালাক, বোকা, সর্ব রকম মানুষই থাকবে, সব নিয়েই একটি জাতি। সুতরাং লক্ষ্য যদি জটিল হয় তবে সবার তা বোধগম্য হবে না। জাতির যে অংশটুকু শিক্ষিত ও মেধাবী, শুধু তাদেরই বোধগম্য হবে- সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হোয়ে ঐ লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম কোরতে পারবে না। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) যে জাতি সৃষ্টি কোরলেন তার ভিত্তি কোরলেন অতি সহজ ও সরল-তওহীদ, একমাত্র প্রভু হিসাবে তাকেই স্বীকার কোরে নেওয়া। এর নাম দিলেন দীনুল কাইয়্যেমা ও সেরাতুল মোস্তাকীম, চিরন্তন, সহজ সরল পথ। এটাই যে সবকিছু তা বোঝাবার জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরজ) কোরে দিলেন প্রতি রাকাতে ঐ সেরাতুল মুস্তাকীমে চালাবার প্রার্থনা করা, যাতে প্রতিটি মোসলেমের সর্বক্ষণ এ সহজ সরল পথের কথা মনে থাকে এবং ঐ সহজ সরলতার ভিত্তি ছেড়ে জটিলতার দিকে সরে না যায়। এবং জাতির লক্ষ্যও স্থির কোরে দিলেন অতি সহজ ও সরল-ঐ দীনুল কাইয়্যেমাকে, সেরাতুল মোস্তাকীমকে সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে পৃথিবীতে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। দুটোই বুঝতে সহজ। সহজ বোলেই বিশ্বনবীর (দঃ) সৃষ্ট অত্যন্ত অশিক্ষিত জাতিটি, যার মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা হাতে গোনা-যেতো তারাও ভিত্তি ও লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা থেকে চ্যুত হোন নি এবং তারা সফলভাবে আল্লাহ রসুলের (দঃ) উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বহু দূর অগ্রসর হোয়েছিলেন। কিন্তু অতি বিশ্লেষণের বিষময় ফলে ঐ দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম হোয়ে গেলো অত্যন্ত জটিল, দুর্বোধ্য এক জীবন-বিধান, যেটা সম্পূর্ণ শিক্ষা করাই মানুষের এক জীবনের মধ্যে সম্ভব নয়- সেটাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তো বহু দূরের কথা। জাতি লক্ষ্যচ্যুত তো আগেই হোয়ে গিয়েছিলো, তারপর ফকিহ ও মুফাস্সিরদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে জাতির মধ্যে ভয়াবহ বিভেদ সৃষ্টি হোয়ে, বিভিন্ন মাযহাব ও ফেরকা সৃষ্টি হোয়ে যে অনৈক্য সৃষ্টি হলো তার ফলে পুনরায় একতাবদ্ধ হোয়ে সংগ্রাম করার সম্ভাবনাও শেষ হোয়ে গেলো। এই জন্য রসুলাল্লাহ (দঃ) বোলেছিলেন আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর।

অতি বিশ্লেষণ কোরে দীনের প্রাণশক্তি বিনষ্ট কোরে দেওয়ার কাজটা নতুন নয়. আমাদের পণ্ডিতরাই শুধু এ কাজ করেন নি। পূর্ববর্তী দীনগুলোতেও অতি-ধার্মিকরা গজিয়েছে ও পাণ্ডিত্য জাহির কোরে তাদের দীনগুলোকে ধ্বংস কোরে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোর'আনে একটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন তার নবী মুসার (আঃ) জীবনী থেকে যেখানে আল্লাহ বনী ইসরাইলদের একটি গরু কোর'বানী কোরতে আদেশ দিলেন। মূসা (আঃ) যখন এই কোর'বানীর আদেশ বনী ইসরাইলদের জানিয়ে দিলেন তখন যদি তারা মোটামুটি ভাল একটি গরু এনে কোর'বানী কোরে দিতো তাহলে তাতেই কাজ হোয়ে যেতো। কারণ কোরবানীর গরুটা কেমন হবে সে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন শর্ত দেন নি। কিন্তু আল্লাহ কোর'আনে বোলছেন- বনী ইসরাইল তা করে নি। তারা মুসার (আঃ) মাধ্যমে আল্লাহকে প্রশ্ন কোরতে লাগলো- গরুটার বয়স কত হবে, গায়ের রং কি হবে, সেটা জমি চাষের জন্য শিক্ষিত কিনা, জমিতে পানি দেয়ার জন্য শিক্ষিত কিনা, ওটার গায়ে কোন খুঁত থাকতে পারবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি । তারা প্রশ্ন কোরে যেতে লাগলো আর আল্লাহ তাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। তারপর যখন প্রশ্ন করার মত আর কিছুই রইলো না তখন স্বভাবতঃই ঠিক অমন একটি গরু পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হোয়ে দাঁড়ালো। একটা সহজ সরল আদেশ- "একটা গরু কোরবানী কর" এটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন কঠিন কোরে ফেলা হলো যে, অমন গরু আর পাওয়া যায় না। এই জাতির মহা পণ্ডিতরাও বিশ্বনবীর (দঃ) ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর ঠিক ঐ কাজটাই মহা ধুমধামের সাথে আরম্ভ কোরলেন। দু'টি মাত্র আদেশ- আমাকে ছাড়া কাউকে মানবে না আমার দেয়া জীবন-বিধান ছাড়া আর কোন বিধান মানবে না, আর এই জীবন-বিধানকে সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরবে। সহজ, সরল দু'টি আদেশ। বিশ্বনবীর (দঃ) উম্মাহ ইস্পাতের মত কঠিন ঐক্য নিয়ে ঐ কাজ কোরতে আরব থেকে বের হোয়ে অবিশ্বাস্য ইতিহাস সৃষ্টি কোরেছিলেন। পূর্ববর্তী দীনের পণ্ডিতদের মত এ উম্মাহর পণ্ডিতরাও একে ধ্বংস কোরে দিলেন।

> একটা সহজ সরল আদেশ- "একটা গরু কোরবানী কর" এটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন কঠিন কোরে ফেলা হলো যে, অমন গরু আর পাওয়া যায় না। এই জাতির মহা পণ্ডিতরাও বিশ্বনবীর (দঃ) ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর ঠিক ঐ কাজটাই মহা ধুমধামের সাথে আরম্ভ কোরলেন।

[সমস্ত পৃথিবীময় অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত ইত্যাদি নির্মুল করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদ নামক আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তাঁকে প্রকৃত এসলামের যে জ্ঞান দান কোরেছেন তা তিনি যতটা সম্ভব হোয়েছে বই-পুস্তক লিখে, বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা কোরেছেন। এই নিবন্ধটি লেখকের বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্য থেকে সম্পাদিত।

আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই

বর্তমানে আমরা এক ভয়াবহ দুঃসময় অতিক্রম কোরছি। সামাজিক অন্যায়, নেতৃবৃন্দের অসততা, অঙ্গীকারভঙ্গ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, হানাহানি ইত্যাদির মধ্যে মানবজাতি নিমজ্জিত হোয়ে আছে। আমরা মনে করি এই অবস্থাটি সৃষ্টির পেছনে কেবল কোন একক ব্যক্তি বা দল দায়ী নয়, **প্রধানত দায়ী হোচ্ছে আমাদের সিস্টেম বা জীবনব্যবস্থা**। একদিনে হঠাৎ কোরে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। **আমরা যখন বৃটিশ খ্রিস্টানদের গোলাম ছিলাম তখন থেকেই তারা আমাদের উপর আল্লাহহীন, স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী এক সিস্টেম চাপিয়ে দিয়েছে**। ভৌগোলিকভাবে বর্তমানে স্বাধীন হোলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিকভাবে এখনও তারাই আমাদের প্রভু। সেই থেকে আজও তাদের দেওয়া সিস্টেমে আমাদের সবকিছু চোলছে। আমরা ভুলেই গেছি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর নিজের তৈরি একটি সিস্টেম দিয়েছেন, আল্লাহর দেওয়া সেই সিস্টেম আমরা ত্যাগ কোরে ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের তৈরি সিস্টেম গ্রহণ কোরে নিয়েছি। এই সমস্ত সিস্টেমে বাস কোরে কেউ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভাল হতে পারবে না; কোনভাবে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটানো যাবে না; ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট ইত্যাদি ঠেকানো যাবে না। বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ও জটিল আকার ধারণ কোরবে। আফ্রিকা থেকে শুরু কোরে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় সকল দেশে আজ একটি অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ কোরছে। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, আন্দোলন, ভাঙচুর, হরতাল, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি হোচ্ছে। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়। ক্ষমতাসীন একটা সরকারকে প্রবল আন্দোলন, জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে টেনে হিঁচড়ে ক্ষমতা থেকে নামানো হয়, আরেক দলকে ক্ষমতায় বসানো হয়। তারা এসে আবার পূর্ববর্তী সরকারের মতই দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার ইত্যাদি কোরতে থাকে। সরকারের বিরুদ্ধবাদীর উপর চলে দমন পীড়ন আর পর্দার অন্তরালে চলে বৈদেশিক প্রভুদের মনোরঞ্জনের প্রতিযোগিতা। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখে দেখে মানুষ হতাশ। কিন্তু তাদের কাছে কোন উত্তম বিকল্প নেই। তাই তারা একবার কড়াই থেকে চুলায় লাফিয়ে পড়ছে, আবার বাঁচার জন্য লাফিয়ে কড়াইতে উঠছে। এতে কোরে দিনে দিনে তাদের যন্ত্রণা বাড়ছে এবং বাড়বে, কমার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ আপনার চলার পথটাই যদি বাঁকা হয় তবে আপনি শত চেষ্টা কোরেও সোজা চোলতে পারবেন না, পথই আপনাকে বাঁকা চোলতে বাধ্য কোরবে। সুতরাং চলমান এই সিস্টেম না পাল্টালে মুক্তি নেই- এটা একেবারে সাফ কথা।

> *এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখে দেখে মানুষ হতাশ। কিন্তু তাদের কাছে কোন উত্তম বিকল্প নেই। তাই তারা একবার কড়াই থেকে চুলায় লাফিয়ে পড়ছে, আবার বাঁচার জন্য লাফিয়ে কড়াইতে উঠছে। এতে কোরে দিনে দিনে তাদের যন্ত্রণা বাড়ছে এবং বাড়বে, কমার কোন সম্ভাবনা নেই।*

ঠিক অনুরূপ অবস্থা ছিল এসলাম-পূর্ব আরবের। আরবের গোত্রগুলির মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধেই চোলত, যা পুরুষাণুক্রমে অব্যাহত থাকতো। এই শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলিই যখন আল্লাহর রসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে মানবরচিত সকল তন্ত্র-মন্ত্র, বিধি-ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ কোরেছিল অর্থাৎ লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান গ্রহণ কোরি না) এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত কোরেছিল, তখন তারা হোয়ে গেল বিশ্বজয়ী একটি জাতি। প্রায় নিরক্ষর আরবদের থেকে এমন একটি জাতির উন্মেষ ঘেটিল যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হোল। আল্লাহর রসুলের আনীত সিস্টেম বা জীবনব্যবস্থা আইয়্যামে জাহেলিয়াতের পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন মানুষগুলোকে ভাই বানিয়ে ফেললো। আত্মিক উন্নতির ফলে প্রতিটি মানুষ একেক জন সোনার মানুষে রূপান্তরিত হোয়ে গেলেন। চুরি, ডাকাতি প্রায় বন্ধ হোয়ে গেল। অভাব, অনটন, দারিদ্র্য দূর হোয়ে সমাজে সমৃদ্ধি আসলো। আজ আমরা রসুলাল্লাহর যে সাহাবীদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে জানি, তাঁরা আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমে প্রবেশের আগেও কি এমনই ছিলেন? না। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঠিক তাঁরাই একেকজন মহামানবে পরিণত হন। আজ আমরা তাদের নামের পরে বোলি 'রাদি আল্লাহু আনহুম' অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁর প্রতি খুশি।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটেও আমাদের সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে আল্লাহর দেওয়া সেই অপরূপ, নিখুঁত সিস্টেমটি। মানুষ নামক এই প্রাণী সৃষ্টি কোরেছেন আল্লাহ, কাজেই কোন্ রাস্তায় বা সিস্টেম-এ সে সুখে থাকবে সেটা ভালো জানেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমই হোচ্ছে সরল পথ, কাজেই এর নামই আল্লাহ রেখেছেন সেরাতুল মোস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ।

আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় সেই প্রকৃত এসলাম আবার হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রকৃত এসলামের যে রূপরেখা অঙ্কন কোরেছেন, আমরা যদি সে মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত কোরি, আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনে পরিপূর্ণ শান্তিতে, প্রগতিতে বাস কোরতে পারবো। তাই মানবজাতির প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন, আমরা বার বার ব্যক্তিকে পাল্টানোর চিন্তা না কোরে সিস্টেমটাকেই পাল্টাই। আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমই পারে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও রক্তপাতের পথ বন্ধ কোরে দিতে। সেই সিস্টেম বাস্তবায়নের ফলে আজকের ঘুণে ধরা সমাজের অসৎ মানুষগুলিই একেকজন সোনার মানুষে পরিণত হবে এনশা'আল্লাহ। মানবজাতি যদি পাশ্চাত্য ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' দাজ্জালের চাপিয়ে দেওয়া আল্লাহহীন, বস্তুবাদী এই সিস্টেম বাদ দিয়ে আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম গ্রহণ কোরে নেয় তবে সে মুহূর্ত থেকেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে, ঠিক যেমনটি হোয়েছিল ১৪০০ বছর আগে।

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১১৯১৩৬৭১১০]